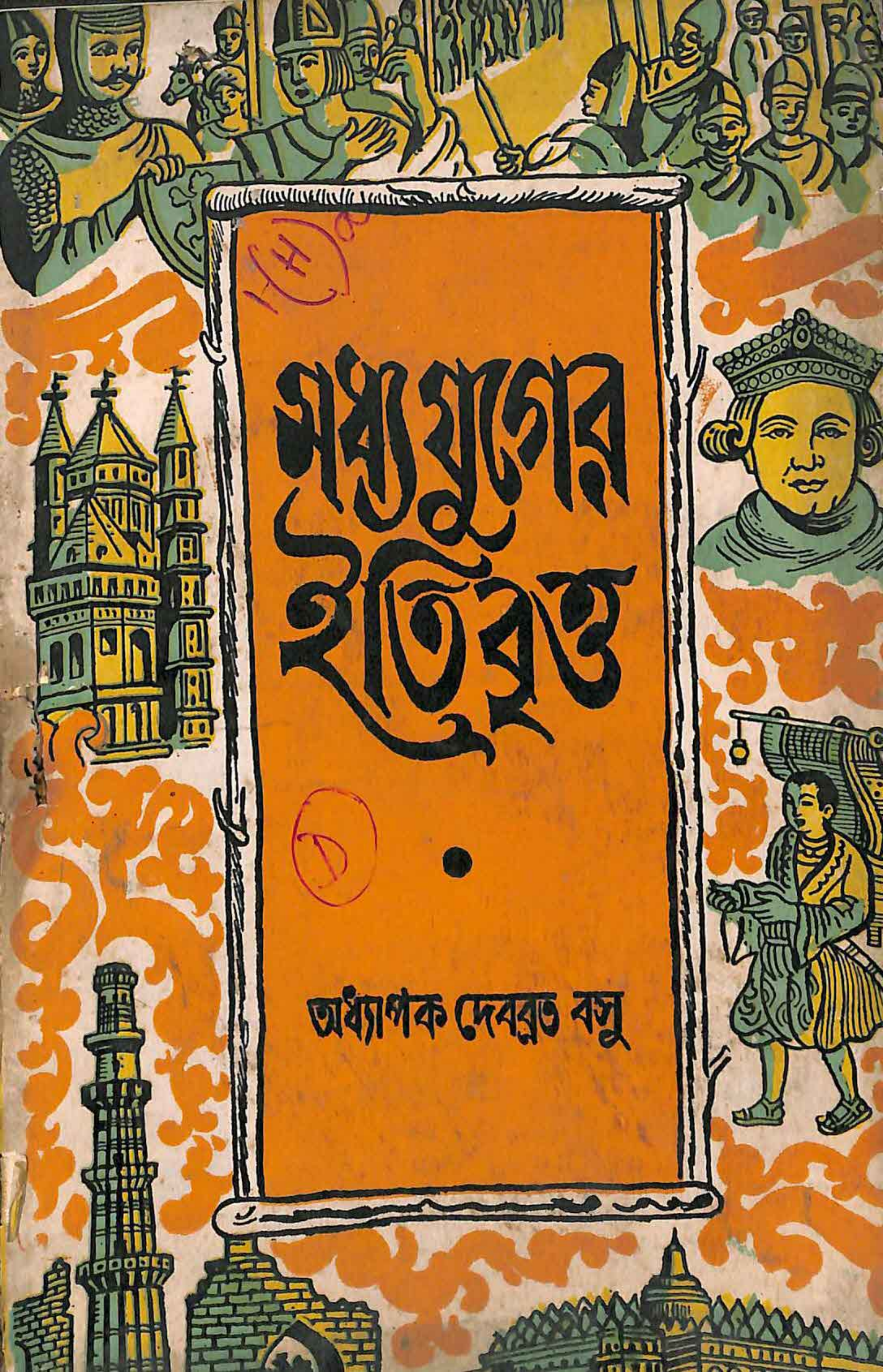

মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত
অধ্যাপক দেবব্রত বসু

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a History Text Book for Class VII, Vide T. B. No. VII|H|81|3, dated 8.1.81

মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

দেবব্রত বসু, এম. এ.
অধ্যাপক, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, মেদিনীপুর

দে বুক কনসার্ন
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
প্রশান্ত দে
দে বুক কনসার্ন
১৪এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২৯শে মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২
চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৩
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৪
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য : এগার টাকা মাত্র

[ক্রেতাসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন মুদ্রিত মূল্যের অধিক না দেন।]

মুদ্রণ :
শ্রীচন্দনকুমার বক্সী
প্রিন্টিং সিন্ডিকেট
৮, মদন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লিখবার সময় কিছুটা সঙ্কোচ ছিল, সংসদ-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীকে নূতন শিক্ষার্থীর কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারব কিনা। অনেক সময় সহজপাচ্যও পরিবেশকের ত্রুটিতে দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন যুগের ইতিহাস যাতে কোন প্রকারেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিভীষিকার কারণ না হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ 'প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস'কে যে সমাদর করেছেন তাতে আমার শঙ্কা ও সঙ্কোচ দূর হওয়ায় সপ্তম শ্রেণীর জন্যে মধ্যযুগের ইতিহাস লিখতে উৎসাহিত হয়েছি।

প্রাচীন যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা—মধ্যকালীন সময়কে ইতিহাসে মধ্যযুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে মধ্যযুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাত্রির অবসানে যেমন প্রভাতের সূচনা—মধ্যযুগও তাই। প্রাচীন যুগ মানব-জীবনের গোড়াপত্তন, মধ্যযুগ মানব-সমাজের ভবিষ্যতের রূপ-রেখা।

পঞ্চম শতকে বর্বর জাতিদের আক্রমণে অনেক প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন বিলুপ্ত হয়েছে, তেমনি অনেক সম্রাট ও মানবহিতৈষীর অবদানে নূতন সাম্রাজ্য ও নগরীর পত্তন এবং ধর্মমতের সংস্কার হয়ে পরবর্তী কালকে প্রভাবিত করেছে। চার্চ বা যাজক-শাসিত সমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। সামন্ত প্রভুদের বিলাসবহুল জীবন সহজ করবার জন্যে সার্ফ বা দাসেরা কায়ক্লেশে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছে। তাদের চিন্তা-ভাবনা সব কিছুই ছিল আচ্ছন্ন।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সমাজ, সভ্যতা ও ধর্মের সংস্কারক ও বাহক হিসেবে যেমন অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংসকারী রক্তলোলুপের সংখ্যাও নগণ্য নয়। মধ্যযুগকেই প্রথম যুক্তি-তর্কের, বিচার-বিশ্লেষণের যুগ বলা সঙ্গত হবে। কোন কিছুকে নির্বিচারে না-মানার সূচনা হয় এ যুগেই। ফলে চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থায়—যে সমাজ-ব্যবস্থা ছিল শাসক ও শাসিতের—শোষক ও শোষিতের লীলাক্ষেত্র—সেই সমাজ-ব্যবস্থায় আলোড়ন দেখা দেয়, যার ধারা আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। ঘটনার বৈপরীত্য অত্যন্ত বেশি বলে স্বল্প পরিসরে মধ্যযুগের ইতিহাসের উপস্থাপনাও শ্রমসাধ্য। পর্ষদ-নির্দেশিত পাঠ্যসূচীকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে, সীমাবদ্ধ পরিসরে, নূতন শিক্ষার্থীর উপযোগী করে সপ্তম শ্রেণীর জন্যে 'মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত' রচনা করা হল। এর দ্বারা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে মধ্যযুগের রূপ-রেখা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল করতে পেরে থাকি তবেই শ্রম সার্থক বলে মনে করব। ইতি—

কলিকাতা
২৯শে মে, ১৯৮০

দেবব্রত বসু

সূচীপত্র

১ | মধ্যযুগের সূচনা ও বিকাশ

আমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাসে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টির আদি পর্বের কাহিনী পাঠ করেছি। কৃষির সঙ্গে ধীরে ধীরে আবিস্কৃত হয়েছিল তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা আরও কত কি ধাতু। মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু সভ্যতার কাহিনী পাঠ করে জেনেছি প্রাচীন যুগের মানুষ কেমন করে সভ্যতা সৃষ্টির আগ্রহে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। প্রাচীন যুগের চরম সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় গ্রীক-রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতিতে। প্রথমে গ্রীক, তারপর রোম। এই রোমানেরা জগৎজোড়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমানেরা দেশ-বিদেশে তাদের সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেয়।

ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়েই ইতিহাস। কালের নিয়মে রোমান সম্রাটদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়। বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙতে শুরু করে। তারপর কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় ও তার প্রভাব কেমন করে ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল—মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা অনেক কথাই জানতে পারব।

ইতিহাসের ধারাবাহিক বিকাশ হল যুগ। **প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক** —এই তিনটি যুগ। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কালসীমা হল প্রাচীন যুগ। **পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল হল মধ্যযুগ**। তারপর শুরু হয় আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর প্রথম পর্যায়ই হল **মধ্যযুগ**।

পরাজিত শেষ রোমান সম্রাট ও তার পরবর্তী পর্যায়ঃ তোমরা আগেই জেনেছ প্রাচীন যুগের চরম বিকাশ ঘটেছিল রোমানদের সাম্রাজ্যের প্রসারে—একদিকে ব্রিটেন থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত, আর একদিকে উত্তর সাগর থেকে আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত। শক্তি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে এটি ছিল অতুলনীয়। বহু দেশ ও জাতি রোমানদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিরাট বিস্তৃতি এবং তার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি রোমান সম্রাটদের বিলাসী, যুদ্ধবিমুখ এবং দায়দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য করে তুলেছিল। তারই পুরোপুরি সুযোগ নিল রোমানদের শত্রুরা। চারদিকে চলছে বিশৃংখলা আর অরাজকতা। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরীর অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন। এই অবস্থায় দূরদর্শী রোমান সম্রাট **কনস্ট্যানটাইন** পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন নগরী। পরে এই নগরীর নাম হয় **কনস্টান্টিনোপল**।

রোমানদের সামরিক শক্তি ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নৈতিক দিক থেকে চরম অধঃপতন দেখা দেয়। এই সুযোগে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে **গথ, ফ্র্যাঙ্ক, ভ্যান্ডাল** প্রভৃতি বর্বর জাতিগুলি অভিযান চালায়। সব শেষে আসে **হুণেরা**। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে **ওডোসার** নামে একজন জার্মান বীর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান চালান। দুর্বল রোমান সম্রাট **রোমিউলাস অগস্টাস** তাঁর কাছে পরাজিত হন। রোমান সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে ওডোসার হলেন রোমান সম্রাট। এমনিভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কনস্টাণ্টিনোপল নগরীকে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসের বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল নগরীর গৌরবময় ভূমিকার বিবরণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে জানতে পারব। বর্বর জাতির আক্রমণে রোম নগরী বিধ্বস্ত হওয়ার পরে মধ্যযুগের ইতিহাসে নানা দিক থেকে পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল এবার তারই আলোচনা করা হল।

নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ঃ সামাজিক দিক থেকে এ যুগে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উদ্ভব হয়। জমির মালিকানার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ পূর্বের বিশাল সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে নতুন নতুন রাজ্যের উদ্ভব হয়। রাজারা ছিলেন স্বাধীন। নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলের ওপর তাঁদের প্রভাব ছিল। প্রত্যেক রাজা নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করেন।

নতুন শিক্ষা-দীক্ষা ঃ মধ্যযুগের খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা চার্চ ও মঠগুলিতে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। সেটা ছিল প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষা। এছাড়া মধ্যযুগে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ মধ্যযুগে প্রাচীন দাসপ্রথার অবসান ঘটে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে শোষণ ও বৈষম্য দেখা দেয়। সমাজের উঁচু তলা থেকে নীচু তলা পর্যন্ত তখন ধারাবাহিকভাবে শোষণ চলে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যে তীব্র শোষণ চলেছিল তার চরম মাশুল দিতে হয়েছিল ভূমিহীন চাষী বা সার্ফদেরই।

ভারতে মধ্যযুগের সূচনা ঃ ইউরোপের ইতিহাসে যেমন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল, ভারতের ইতিহাসেও তেমনি গুপ্তবংশের পতনে প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। প্রথম যুগের গুপ্তরাজারা খুবই পরাক্রান্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই বংশের রাজারা তেমন উল্লেখযোগ্য শাসন নিপুণতা বা পরাক্রমের পরিচয় দিতে পারেননি। এ

সময়ে হূণ, পুষ্যমিত্র প্রভৃতি বর্বর জাতিগুলি গুপ্তরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে অভিযান চালাতে থাকে। স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শেষ পরাক্রান্ত গুপ্তসম্রাট। তিনি পুষ্যমিত্র ও হূণদের দমন করেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তসম্রাটেরা সে আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন।

গুপ্তবংশের ভাঙনের পালা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। বহু ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এমনিভাবে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উদ্ভব হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতামুক্ত **ভল্লবীর, মৈত্রক বংশ, মান্দাসোরের যশোধর্মন** ইত্যাদিরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালান। তাঁদের অধীনে ছিল নিজস্ব সৈন্যবাহিনী।

মধ্যযুগের সময়কাল ঃ সাধারণভাবে পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে পঞ্চদশ শতকে অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্টাণ্টিনোপল নগরীর পতনের সময়কালকেই মধ্যযুগের সময়সীমা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল এই যুগ।

মধ্যযুগের জীবনধারার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাচীন যুগের জীবনধারার লোপ পাওয়ার পরেই এক পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার বিকাশ হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগের জীবনধারার বিকাশের ধারা মধ্যযুগে অক্ষুণ্ণ থাকলেও ধীরে ধীরে তা লোপ পেতে শুরু করে।

মধ্যযুগের সময় নির্ধারণের অসুবিধা ঃ পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে প্রাচীন যুগের অবসান আর মধ্যযুগের সূচনা হয়নি। কোথাও হয়েছে আগে, আবার কোথাও বা পরে। ইউরোপের মধ্যযুগ ৪৭৬ খ্রীঃ আরম্ভ হলেও ভারতের ক্ষেত্রে মধ্যযুগ ৫৫০ খ্রীঃ বা তারও পরে আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে।

সমাজ বিকাশের বৈশিষ্ট্য ঃ আমরা জানি দেশ-বিদেশে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের জীবনধারায় পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য সব দেশে মধ্যযুগীয় জীবনধারায় একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইউরোপে যেভাবে বিকশিত হয়েছিল এশিয়ায় সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি। তাই সাধারণ হিসেব-নিকেশের মানদণ্ডে সব দেশের মধ্যযুগের ইতিহাস নিরূপণ করা খুবই কঠিন। বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করেন। সেই হিসেবে পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতককে মধ্যযুগ বলা হয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। শেষ রোমান সম্রাটের পতন কিভাবে হয়েছিল ?

২। কখন ও কিভাবে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয় ?

৩। ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে মধ্যযুগ শুরু হয় ?

৪। মধ্যযুগে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবনধারার কি কি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগের সময় নির্ধারণে অসুবিধা দেখা দেয় কেন ?

২। মধ্যযুগে সমাজ বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি জান ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ**

(ক) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কি ছিল ? (খ) ওডোসার কে ছিলেন ? (গ) শেষ রোমান সম্রাটের নাম কি ?

২

॥ পশ্চিমে মধ্যযুগ ॥

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও বর্বর জাতিসমূহের উপনিবেশ স্থাপন

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছিল। পশ্চিমে স্পেন থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের দুই তীরবর্তী অনেকগুলি দেশ রোমান সম্রাটেরা শাসন করতেন। সাম্রাজ্যের বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে রোমান সম্রাটেরা রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা অকর্মণ্য, বিলাসী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। সৈন্যবাহিনী সামরিক শৃংখলা হারায়। তারা খুশিমত একজন সম্রাটকে সরিয়ে আর একজনকে সিংহাসনে বসাত। রোমের জনসাধারণের মধ্যেও যুদ্ধবিমুখ মনোভাব দেখা দেয়। কারণ দীর্ঘকাল বহু যুদ্ধে লিপ্ত থাকার পরে এবার তারা বিশ্রাম চাইছিল। রোমে তখন ক্রীতদাস-প্রথা বজায় ছিল। এজন্য রোমের শ্রমিক, গৃহস্থ সকলেই কর্মবিমুখ, অলস ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমনি করে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল হতে শুরু করে।

বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য জাতি বাস করত। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রায় সকলেই স্বাধীন হতে চায়। এর ফলে কতকগুলি বর্বর জাতি রোমান সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে শুরু করে। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে বাইজান্টিয়ামে একটি নতুন নগরী গড়ে তুলেছিলেন। পরে এই নগরীকে কেন্দ্র করে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরে ছিল জার্মান জাতির বাস। এই জার্মানেরা গথ, ফ্র্যাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, জুট ইত্যাদি নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের প্রলোভনে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করে।

জার্মান বর্বরেরা সকলেই যে শত্রুর মত এসে প্রথম দিকে রোমান সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, তা ঠিক নয়। সব যাযাবর জাতির মতই খাদ্য ও বাসস্থানের আশায় তারা রোমে আসে ও রোমান সম্রাটদের অনুমতি নিয়ে সীমান্তে বসবাস শুরু করে। পরে তারা রোমান সৈন্যদলে যোগ দেয় এবং কখনও বা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধ করেছে। পরে দুর্ধর্ষ হুণদের বেপরোয়া আক্রমণ এবং রোমান সম্রাটদের সাম্রাজ্য রক্ষায়-ব্যর্থতা—জার্মান বর্বরদের সচেতন করে তোলে। আমরা সে আলোচনায় পরে আসব।

হূণদের অভিযান ও বর্বর জাতিদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : জার্মানদের উপনিবেশ স্থাপন : হূণেরা ছিল মধ্য এশিয়া নিবাসী মঙ্গোল নামে যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর শাখা। এরা দেখতে ছিল কদাকার, মাথা ভর্তি চুল, ছোট ছোট চোখ ও চ্যাপ্টা নাক। হূণেরা ছিল সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ায় চড়ে মুহূর্তমধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তারা খুব দ্রুত যাতায়াত করতে পারত। হূণেরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাই ছোটবেলা থেকেই হূণ শিশুরা ঘোড়ায় চড়া শিখত। হূণদের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল অবর্ণনীয়। যে জায়গায় তারা অভিযান চালাত সে জায়গাকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করে দিত।



হূণদলপতি এটিলা রোমের দিকে এগিয়ে চলেছেন

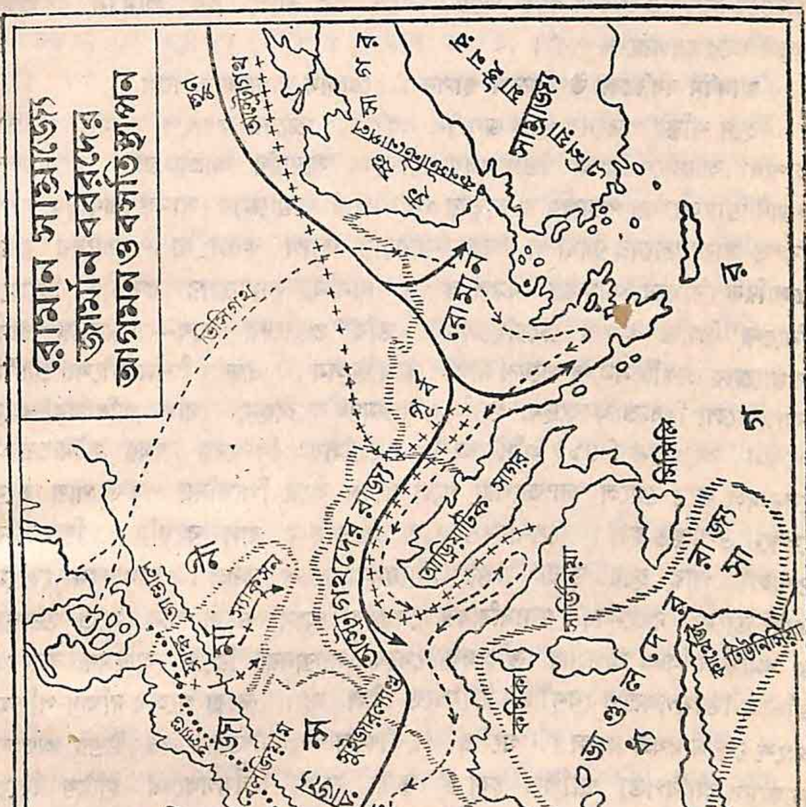
কোন এক শক্তিমান জাতির আক্রমণে হূণেরা একদিন ঘরছাড়া হয়েছিল। এও হতে পারে, খাদ্য ও পশুচারণযোগ্য জমির খোঁজে তারা একদিন নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়। একদল রওনা হয় এশিয়ার দিকে, অন্যদল রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙনের পূর্বে এখানে এসে অভিযান চালায়। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে চীনের পশ্চিমাঞ্চল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে হূণেরা ছড়িয়ে পড়েছিল।

হূণেরা ইউরোপে প্রবেশ করেই প্রথমে গথদের দেশে অভিযান চালায়। তখন বর্তমান বল্কান প্রদেশে গথদের বাস ছিল। গথেরা দু-দলে বিভক্ত ছিল। **অস্ট্রোগথ** ও **ভিসিগথ**। হূণদের আক্রমণে অস্ট্রোগথ ও ভিসিগথ প্রভৃতি জার্মান বর্বরেরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে।

হূণদের প্রতিরোধের জন্য অস্ট্রোগথ ও ভিসিগথরা নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে এই বিপন্ন গথেরা দানিয়ুব নদীর তীরে এসে পৌঁছায় এবং রোমান সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সম্রাট **ভ্যালেন্স** তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু এক সময়ে গথেরা আশ্রয়দাতা রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন সম্রাট ভ্যালেন্স বিদ্রোহী গথদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভ্যালেন্সই গথদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। গথদের মতই ফ্র্যাঙ্ক, ভ্যান্ডাল সকলেই রোমান সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়। এভাবে হূণদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে জার্মানেরা এক শতাব্দীর মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য

প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমশঃ তারা অগ্রসর হতে হতে সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ বুলগেরিয়ায় আসে।

এই চরম দুর্যোগের দিনে অবিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট থিওডোসিয়াস



আতঙ্কিত হয়ে জার্মানদের সঙ্গে একটা আপসরফা করে নিয়েছিলেন। তাই জার্মান বর্বরেরা রোমান সৈন্যদের সহযোগিতায় হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধের

জন্য প্রচেষ্টা চালায়। গথ দলপতি **এলারিক** ও ভ্যান্ডাল দলপতি **স্টিলিকোকে** সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রবল সংঘর্ষের পর হূণ বাহিনী পরাজিত হয়। ৪৫৩ খ্রীঃ অব্দে হূণ নায়ক **এটিলার** মৃত্যুর পরে সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাবে হূণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পর শুরু হয় জার্মান বর্বরদের নতুন করে জাগরণের পর্ব।

জার্মান বর্বরদের উপনিবেশ স্থাপন ঃ রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঃ

হূণ শক্তির পতনের পরে জার্মান বর্বরেরা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করল। হূণদের আক্রমণে বিপন্ন ভিসিগথরা রোমের সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সম্রাট ভ্যালেন্সের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তারা সাম্রাজ্যের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হল। কিন্তু তারা তাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার ত্যাগ করল না। তাদের রাজা **এলারিক** রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে চাননি, সাম্রাজ্যের কর্মচারী হিসেবে নিজের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ দাবী করেছিলেন। এজন্য তিনি গ্রীসের প্রাচীন নগরগুলো বিধ্বস্ত করেছেন, ইটালি আক্রমণ করেছেন, রোম অধিকার করে লুণ্ঠন করেছেন (৪১০ খ্রীস্টাব্দে)। ইটালির বিপদের সময় সীমান্তরক্ষী সেনাদল সরে গেলে **ভ্যান্ডালেরা** গলে প্রবেশ করে পিরেনিজ পর্বত পার হয়ে স্পেনে উপস্থিত হল। সেখানেও তারা স্থির হয়ে বাস করেনি। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে তারা উত্তর আফ্রিকা দখল করল। অবশেষে রোমে এসে তাদের দলনেতা **গ্যাসেরিকের** নেতৃত্বে ধ্বংস ও লুণ্ঠনে মেতে উঠল। এ সময়ে বাল্টিক সাগরের তীরদেশ থেকে স্যাক্সনরা ব্রিটেন আক্রমণ করল। এদিকে ভিসিগথরাও বেশীদিন ইটালিতে রইল না। তারা গলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে স্পেন দখল করল। গলের পূর্বাঞ্চলে বার্গাণ্ডিয়ান ও উত্তর অঞ্চলে ফ্র্যাঙ্কদের আধিপত্য স্থাপিত হল। তারা ক্রমশঃ ভিসিগথদের হটিয়ে দিয়ে সমস্ত গল অধিকার করে নিল। ভিসিগথরা চলে যাবার পর রোমে এসেছিল আরও একদল বর্বর জাতি। তাদের দলপতি **ওডোসার** দুর্বল রোমান সম্রাট **রোমিউলাস অগস্টাসকে** সিংহাসনচ্যুত করে রোমের সিংহাসনে বসেন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অঞ্চলের শাসনকর্তা জেনোও তাঁকে সম্রাট বলে মেনে নেন। এভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে (৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে) রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন একজন বর্বর দলপতি। এতে কার্যতঃ পশ্চিম ইউরোপে রোমান প্রভুত্ব শেষ হয়ে বর্বরদের শাসন শুরু হয় এবং এই সঙ্গে পশ্চিম সাম্রাজ্যের বড় বড় প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধনীদের বাগান বাড়ীতে বাস করতে লাগলো বর্বর জাতিরা। রাস্তাঘাট মেরামতের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পেয়ে গেল।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হল শিক্ষক সম্প্রদায়ও। এক কথায় বলতে গেলে রোম যে সভ্যতার আলো জেবলে রেখেছিল তা নিভে গেল।

রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র : কনস্টান্টিনোপল : বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যেরই শুধু পতন হয়নি—ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্যও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জার্মান বর্বরেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে **বাইজান্টাইন** সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানে রোমান সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, আইন ইত্যাদির চর্চা হত। **সম্রাট জাস্টিনিয়ান** রোম দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত আইনগুলিকে সংকলিত ও বিধিবদ্ধ করে নতুন গৌরব ও মর্যাদা দান করেন। রোমের খ্রীস্টান চার্চের অনুরূপ কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক চার্চও পরবর্তীকালে খ্রীস্টান ধর্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রোম অভিযানকারী কয়েকজন বর্বর দল-নায়ক : পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে যে সব বর্বর জাতি অভিযান চালিয়েছিল এখানে সে সব জাতির দলনেতাদের সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া হল।

এলারিক : ভিসিগথদের দলপতি ছিলেন **এলারিক**। পঞ্চম শতকের সূচনায় তিনি গ্রীসে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাবার পরে ইটালীতে ফিরে আসেন। ইটালীতে আতঙ্ক ও বিভীষিকার সঞ্চার হয়। দুর্বল পশ্চিম রোমান সম্রাট রাজধানী রোম ছেড়ে কোনরকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি স্টিলিকো সসৈন্যে এলারিকের অভিযান প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এলারিক পরাজিত হয়ে কিছুকালের জন্য পিছু হঠেন। এবারের মত পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ও রোমনগরী রক্ষা পেলেও স্টিলিকোর মৃত্যুর পরে এলারিক দ্বিতীয় বার রোম আক্রমণ করে সদলে রোম নগরীর নিকটে উপস্থিত হলেন। রোমবাসীরা ভয়ে আত্মসমর্পণ করল। এলারিক রোমান নাগরিকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে ফিরে গেলেন। এর কিছুকাল পরে এলারিক তৃতীয় বার রোম আক্রমণ করে সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁর বর্বর সৈন্যদল অসংখ্য নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করে রোমের শত শত বছরের সঞ্চিত ধনরত্ন লুঠ করে নিল। ছয় দিন পর্যন্ত অবিরাম হত্যা ও লুণ্ঠন করে এলারিক রো[illegible] ত্যাগ করলেন। গথদের এই আক্রমণে রোম শ্মশানে পরিণত হল। এ[illegible]রি এলারিক আফ্রিকা প্রদেশ জয় করবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে [illegible]ক্ষিণ ইটালীতে এলারিকের মৃত্যু হয়।

হূণদলপতি এটিলা : খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে সু[illegible] রোমান

সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের প্রায় সমস্ত অংশই জার্মানগণ অধিকার করেছিল। কিন্তু হঠাৎ হূণজাতির আক্রমণে জার্মান ও রোমান উভয় জাতির ভীষণ বিপদ উপস্থিত হল। হূণদলপতি এটিলা পূর্ব-এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর থেকে ইউরোপের রাইন নদীর তীর পর্যন্ত ভূখণ্ডে অধিকার বিস্তার করলেন। দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী রাজধানী থেকে এটিলা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। এর ফলে কনস্টাণ্টি-নোপলের সম্রাটকে এটিলার সাথে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করে আত্মরক্ষা করতে হল।

এটিলার আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ছারখার হতে লাগল। একের পর এক অঞ্চল জয় করে এটিলা গলদেশে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে রোমান, ফ্র্যাঙ্ক, গথ ও অন্যান্য জার্মান জাতি একযোগে এটিলাকে আক্রমণ করে। দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এটিলা পরাজিত হন এবং দেড় লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও এটিলা নিবৃত্ত হবার মত লোক ছিলেন না। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আবার লুটপাট করতে করতে রোমে এসে উপস্থিত হলেন। লোকে তাঁকে "বিধাতার রোষানল" নাম দেয়।

এটিলাকে বাহুবলে প্রতিরোধ করবার শক্তি রোমানদের ছিল না। তখন রোমের প্রধান ধর্মগুরু পোপ এটিলার শিবিরে গিয়ে রোম নগরী রক্ষার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এটিলা প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ফিরে যান। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই এটিলার মৃত্যু হয় এবং ইউরোপে হূণদের প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে যায়।

গ্যাসেরিক: হূণ অভিযানে বিপর্যস্ত পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা হয়েছিল শ্মশানের মত। হূণেরা চলে যাবার পরে আসে ভ্যাণ্ডালেরা। এদের দলপতি ছিলেন গ্যাসেরিক। তিনি হূণ দলপতি এটিলার মতই দুঃসাহসী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছিল তাঁর আধিপত্য। তিনি ইটালীতে আধিপত্য স্থাপনের পরে রোম নগরীতে লুণ্ঠন চালান। পনেরো দিন ধরে চলে ধ্বংসের তাণ্ডব। এর কুড়ি বছর পরে সম্পূর্ণ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যও তাঁর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায়নি। উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলি বাদে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছিল ভ্যাণ্ডাল দলপতি গ্যাসেরিকের বিশাল সাম্রাজ্য। ৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে গ্যাসেরিকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে উপযুক্ত রণকুশলী ও দক্ষ সেনানায়কের অভাবে ভ্যাণ্ডালদের শক্তি কমতে শুরু করে। দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল থেকে একদল বর্বর জাতি গিয়ে ভ্যাণ্ডালদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তাদের বিজিত সাম্রাজ্যের অধিকাংশই দখল করে নেয়।

সামাজিক জীবন ঃ জার্মান বর্বরেরা প্রথমে ছিল অসংগঠিত। তারা গ্রামে বাস করত। ঘরগুলি কাঠ, লতাপাতা ও মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী হত। গ্রামের চারদিক ছিল কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। যারা গ্রামে বাস করত তাদের জীবিকা ছিল পশুশিকার ও পশুপালন, চাষবাস এবং মৎস্য শিকার। তাদের প্রধান গৃহপালিত পশু ছিল গরু ও ঘোড়া। রথচালনা তাদের খুব প্রিয় ছিল।

স্ত্রীলোক ও বয়স্করা চাষবাস করত। যুবক ও মধ্যবয়স্করা যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করত। ঢাল, তলোয়ার, বর্ম, বর্শা ও কুড়ুল নিয়ে তারা যুদ্ধ করত।

রাজনৈতিক জীবন ঃ জার্মানেরা ছিল যুদ্ধপ্রিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা চামড়ার ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত। যুদ্ধের সময় দলপতির নির্দেশ সকলে মেনে চলত। জার্মানেরা গথ, ফ্র্যাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট-বড় অনেক দল থাকত। ছোট দলগুলি ছিল কোন বড় দলের অংশবিশেষ। একশ জন সৈন্য নিয়ে এক-একটি ছোট দল গড়ে উঠত। সেজন্য এগুলিকে বলা হত হানড্রেড বা শতক। দশ থেকে কুড়িটি পরিবারের লোক নিয়ে এক-একটি হানড্রেড তৈরী হত। জার্মানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি করে সভা থাকত। এই সভার নাম ছিল মুট বা সাল। এই সভার সভ্যপদ লাভের অধিকার দাসদের ছিল না। অন্য সকলেই এই সভার সভ্য হিসেবে গণ্য হত। যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে এই সভায় আলোচনা করা হত। এই সভাই রাজা নির্বাচন করত। রাজপদ ছিল নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ সভার নির্দেশ অনুযায়ী রাজা রাজকার্য চালাতেন।

ধর্মীয় জীবন ঃ বর্বর জাতিগুলি প্রথমে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা করত। তাদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল অসংখ্য। যেমন, যুদ্ধের দেবতা ওডেন, থর ইত্যাদি। ওডেন দেবতার নাম থেকেই ওয়েডনেসডে, থর দেবতার নাম থেকে থার্সডে প্রভৃতি দিনের নাম হয়েছে। কিছুদিন পরে ফ্র্যাঙ্ক জাতির রাজা ক্লোভিস খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর প্রভাবে জার্মান জাতি ধীরে ধীরে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে।

রোমান সাম্রাজ্যে বর্বর জাতির বসতি স্থাপন ও বর্বর জাতিগুলির উপর খ্রীস্ট-ধর্মের প্রভাব ঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আগন্তুক বর্বর জাতিগুলি বসতি স্থাপন করে। জার্মানদের যে উপজাতি মধ্য-ইউরোপের পূর্বাংশে বাস করত তাদের বলা হত অস্ট্রোগথ এবং মধ্য-ইউরোপের পশ্চিমাংশে যারা বাস করত তাদের নাম ছিল ভিসিগথ। মধ্যভাগে

উপজাতিদের নাম ছিল ভ্যাণ্ডাল ও ফ্র্যাঙ্ক। জার্মানির উত্তরাংশে থাকত এ্যাংলো ও স্যাক্সন ও জুট প্রভৃতি উপজাতিরা। হূণ জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দানিয়ুব নদী পার হয়ে তারা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ভিসিগথরা স্পেন অধিকার করে বসবাস করে। অস্ট্রোগথরা ইটালীতে ও ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করতে লাগল। ফ্র্যাঙ্ক জাতি গল দেশে বসতি স্থাপন করল। পরবর্তীকালে এই দেশের নাম হল ফ্রান্স। এ্যাংলো-স্যাক্সনরা ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করে।

এইভাবে বর্বর জার্মানেরা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

মিশ্র রোমান জাতি ও খ্রীস্টধর্মের প্রভাব ঃ বর্বর জার্মানেরা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে তারা তাদের জাতিসত্তা হারিয়ে রোমানদের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। এমনিভাবে নানা জাতির মিলনে এক নতুন মিশ্র রোমান জাতির উদ্ভব হয়। বর্বর জার্মানেরা ছিল অনুন্নত ও অসভ্য। রোমানদের যুদ্ধে পরাজিত করলেও তারা রোমের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে পারেনি। তাই জার্মান বর্বরেরা নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। রোমানদের প্রভাবে তারা খ্রীস্টধর্মে আগ্রহী হয়। খ্রীস্টধর্মের প্রভাবে বর্বর জাতিগুলি একপ্রাণতার আদর্শে গড়ে উঠেছিল। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে জার্মানদের বর্বর প্রকৃতি শান্ত হয়, তাদের মধ্যে সদাচার ও সংযমের শিক্ষা বিস্তার লাভ করে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল আলোচনা কর।

২। হূণদের সম্পর্কে কি জান? পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে হূণ অভিযান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। হূণ দলপতি এটিলার নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। জার্মানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনধারার পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। গ্যাসেরিক কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

২। কখন ও কিভাবে রোম সাম্রাজ্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছিল ?

৩। এলারিকের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। মিশ্র রোমান জাতির উদ্ভব হয়েছিল কিভাবে ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। নীচের বামদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের শব্দগুলির সঙ্গতিসাধন কর ঃ

(ক) এলারিক	হুণ দলপতি
(খ) গ্যাসেরিক	ভিসি / অস্ট্রোগথ দলপতি
(গ) এটিলা	ভ্যাণ্ডাল দলপতি
(ঘ) ভ্যালেন্স	রোমান সেনাপতি
(ঙ) স্টিলিকো	একজন রোমান সম্রাট

২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ কর ঃ

(ক) হুণদের যুদ্ধের দেবতা থার্স থেকে থার্স-ডে কথার উৎপত্তি হয়েছে। (খ) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টাণ্টিনোপল। (গ) বর্বরদের একশটি দল নিয়ে গড়ে উঠত এক একটি সভা।

৩। মুখে মুখে উত্তর লিখ ঃ

(ক) কয়েকটি জার্মান বর্বর জাতির নাম কর। (খ) হুণ দলপতির নাম কি ছিল? (গ) থর কাদের দেবতা ছিলেন? (ঘ) বর্বর জার্মানদের সমাজে কারা চাষবাস করত? (ঙ) সভা কি? (চ) থিওডোসিয়াস কে ছিলেন? (ছ) ভ্যালেন্স কে ছিলেন? (জ) হুণেরা কোন্ জাতিগোষ্ঠীর শাখা? (ঝ) জার্মানদের প্রধান গৃহপালিত পশু কি ছিল?

৩ | অন্ধকার যুগে ইউরোপে জ্ঞানচর্চা

মানব সভ্যতার ইতিহাস ভাঙাগড়ার কাহিনী দিয়ে গড়ে উঠেছে। শক্তিশালী জাতির কাছে দুর্বল জাতি পরাজিত হয়েছে। কালক্রমে দুর্বল জাতিগুলি শক্তিশালী জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অসভ্য জাতি ক্রমশঃ সভ্য জীবন যাপন শুরু করেছে।

বর্বর জাতিগুলির ক্রমাগত আক্রমণে কিভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল তার বিবরণ আমরা আগের অধ্যায়ে জানতে পেরেছি। হূণ, গথ, ফ্র্যাঙ্ক, ভ্যান্ডাল বর্বর জাতিগুলি ছিল অসভ্য, অনুন্নত। উন্নত জীবন যাপনের আগ্রহ তাদের ছিল না। সেজন্য ধ্বংসের উন্মত্ত তাণ্ডবে তারা মেতে থাকত। রোমান সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান—সেগুলির গুরুত্ব বোঝবার মত শক্তি ও সামর্থ্য বর্বর জাতিগুলির ছিল না। সেজন্য পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় সব কিছুই বিলীন হয়ে যেতে থাকে। চারদিকে তখন ঘনিয়ে আসে অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার অন্ধকার। কারণ প্রথমতঃ, এই যুগে রোমের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে ৪৭৬ খ্রীঃ অব্দে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সমাজে আইন-শৃংখলার অবনতি হয়। দ্বিতীয়তঃ, রোমান আমলে ইউরোপে যে রাজনৈতিক ঐক্য বজায় ছিল তা ধ্বংস হয়। তৃতীয়তঃ, বর্বর জাতিরা খ্রীস্টধর্মের অনুরাগী ছিল না, তারা প্যাগান বা পৌত্তলিক ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল। চতুর্থতঃ, রোমান যুগে ইউরোপে উন্নততর যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবের ফলে অর্থ-নীতি ভেঙ্গে পড়ে। পঞ্চমতঃ, মানুষের মনে যুক্তিবাদের পরিবর্তে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দেখা দেয়। ইউরোপের মনোজগৎ অজ্ঞানতায় ভরে যায়। এই সময়কে তাই ইউরোপের ইতিহাসে বলা হয় **অন্ধকার যুগ**। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত হল এর সময়সীমা। তারপর এই অবস্থা ক্রমশঃ কেটে যায়। অন্ধকার যুগের পর ধীরে ধীরে আলোর রেখা ফুটে উঠতে থাকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে জ্ঞানচর্চা : বর্বর জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত ইউরোপের রাজারা যুদ্ধ-বিগ্রহে মেতেছিলেন। সাধারণ মানুষ জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। চারদিকের এরূপ ভাঙাগড়া সত্ত্বেও জ্ঞানচর্চার ধারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারেনি। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। খ্রীস্টধর্ম তখন বিদেশী বর্বরদেরও প্রভাবিত করে-ছিল। তাই খ্রীস্টান মঠ ও গীর্জার ওপর হামলা চালাতে বিদেশী শত্রুরাও

বড় একটা সাহস পায়নি। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল প্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা ছিলেন নিষ্ঠাবান জ্ঞানসাধক। বেনেডিক্ট, অগাস্টাইন প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা খ্রীস্টীয় মঠগুলিকে পরিশুদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ করে এক সেবাময় জীবনের আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁরা সেদিন বুঝেছিলেন ধর্ম-প্রচারের ক্ষেত্রে সাধারণ লেখাপড়া জানা দরকার। অন্ততঃ খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল কিংবা যীশুর জীবন-কাহিনী ভাল করে না পড়লে সব কথা সহজভাবে সাধারণ মানুষকে বোঝান যায় না। তাই মঠের সন্ন্যাসীরা তখন লেখা-পড়ার চর্চা করতেন।

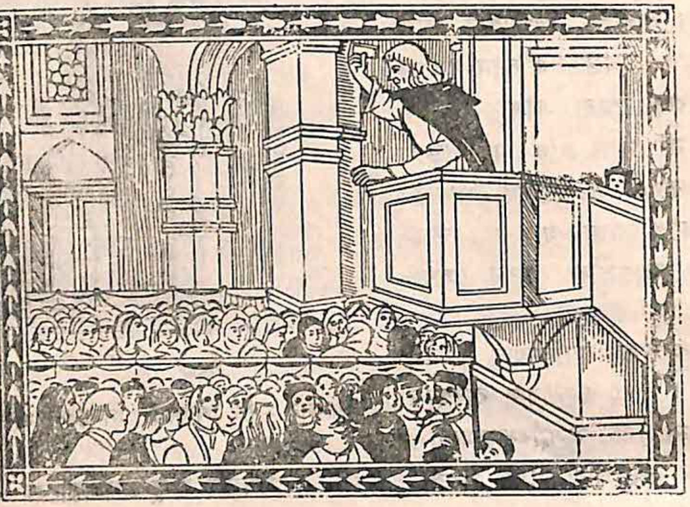

অন্ধকার যুগে শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র খ্রীস্টান মঠ

কাগজের আবিষ্কার তখনও হয়নি। বই ছাপাবার ব্যবস্থাও ছিল না। বহু অসুবিধার মধ্যেও খ্রীস্টান সন্ন্যাসীরা পুঁথির নকল করতেন। সেগুলি জন্তু-জানোয়ারের চামড়ার ওপর লিখে রাখতেন। তখন তাঁদের মধ্যে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার যথেষ্ট চর্চা হত।

মধ্যযুগের শিক্ষা-দীক্ষার চর্চার দিক থেকে বাইজানটাইনের গ্রীক পণ্ডিতদের দানও উল্লেখযোগ্য ছিল। তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান জ্ঞানসাধক। তাঁরা গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন এবং রোমান রাষ্ট্রনীতির চর্চা করতেন। চারদিকের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যেও জ্ঞানের আলোকশিখা তাঁরা সেদিন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এসব জ্ঞানী ব্যক্তি ও শিক্ষিত সন্ন্যাসীদের জ্ঞান লাভের আগ্রহ ধীরে ধীরে বর্বর জাতিগুলিকে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। আর তার ফলে এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হওয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালাতে শুরু করে।

পাপ-পুণ্যবোধ এবং তার প্রভাব ঃ আমরা জানি খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এতে খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক মহান যীশুর উপদেশ সংকলিত হয়েছে। সব ধর্ম-প্রচারকের মত মানবজাতিকে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার ও পবিত্র করে তোলাই ছিল মানব-প্রেমিক যীশুর কামনা। তাই সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কি করা

উচিত আর কি করা উচিত নয়, তাঁর উপদেশে সে কথাই বলা হয়েছে। এ থেকেই গড়ে উঠেছে পাপ আর পুণ্য সম্পর্কে ধারণা। ভাল কাজ করলে পুণ্য হয়; আর খারাপ কাজ হল পাপ। যে পাপ করে তাকে ভোগ করতে হয় অনন্ত নরক। বাইবেলে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। তাই বাইবেলের পবিত্র নির্দেশ অনুসরণ করে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনকে



অন্ধকার যুগে এই সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল

গড়ে তোলা প্রতিটি খ্রীস্টানের কাছে পবিত্র কর্তব্য বলে গণ্য হয়। খ্রীস্টান ধর্ম-প্রচারকেরা ক্ষমা, শান্তি, সৌভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করে ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করেন। রোমান চার্চের ধর্মগুরু পোপের নেতৃত্বে ও উৎসাহে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নতুন করে খ্রীস্টান ধর্মের প্রচার শুরু হয়। ক্রমশঃ ইউরোপবাসী এক ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে খ্রীস্টীয় জগতের এক ঐক্যধর্মী আদর্শ উপলব্ধি করে। জাতীয়তার আদর্শের পরিবর্তে ধর্ম-ভিত্তিক আদর্শ ইউরোপের বিভিন্ন খ্রীস্টানধর্মী রাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের বন্ধন ঘটাল। কি ব্যক্তিজীবন, কি সামাজিক জীবন, কি রাষ্ট্রীয় জীবন সকল ক্ষেত্রেই পাপ-পুণ্যবোধ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সময়ে খ্রীস্টান চার্চ ও গীর্জার পবিত্রতা স্বীকৃত হয়। রাজা-প্রজার আচার-আচরণে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। অনেক রাজা খ্রীস্টান ধর্মের আদর্শে প্রজাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। রাজার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এক অলৌকিক ধারণার সৃষ্টি হয়। রাজা মর্ত্যে ভগবানের প্রতিনিধি; তাঁর সঙ্গে খারাপ

ব্যবহার করা হল পাপ করা। আবার খ্রীস্টান পোপ হলেন সর্বোচ্চ ধর্মনিয়ন্তা। তাঁর নির্দেশ হল অলঙ্ঘনীয় ; যারা অমান্য করবে তারা পাপের দায়ভাগী হবে। এমনি করে খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য নানাভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এতে ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায় ; খ্রীস্টান চার্চকে কেন্দ্র করে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপে কখন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের উদ্ভব হয় ? এ যুগের জীবনধারায় কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল ?

২। পাপ-পুণ্যবোধ বলতে কি বোঝ ? ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মধ্যযুগে পাপ-পুণ্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বর্বর জাতিদের মধ্যে কিভাবে পরিবর্তন আসে ?

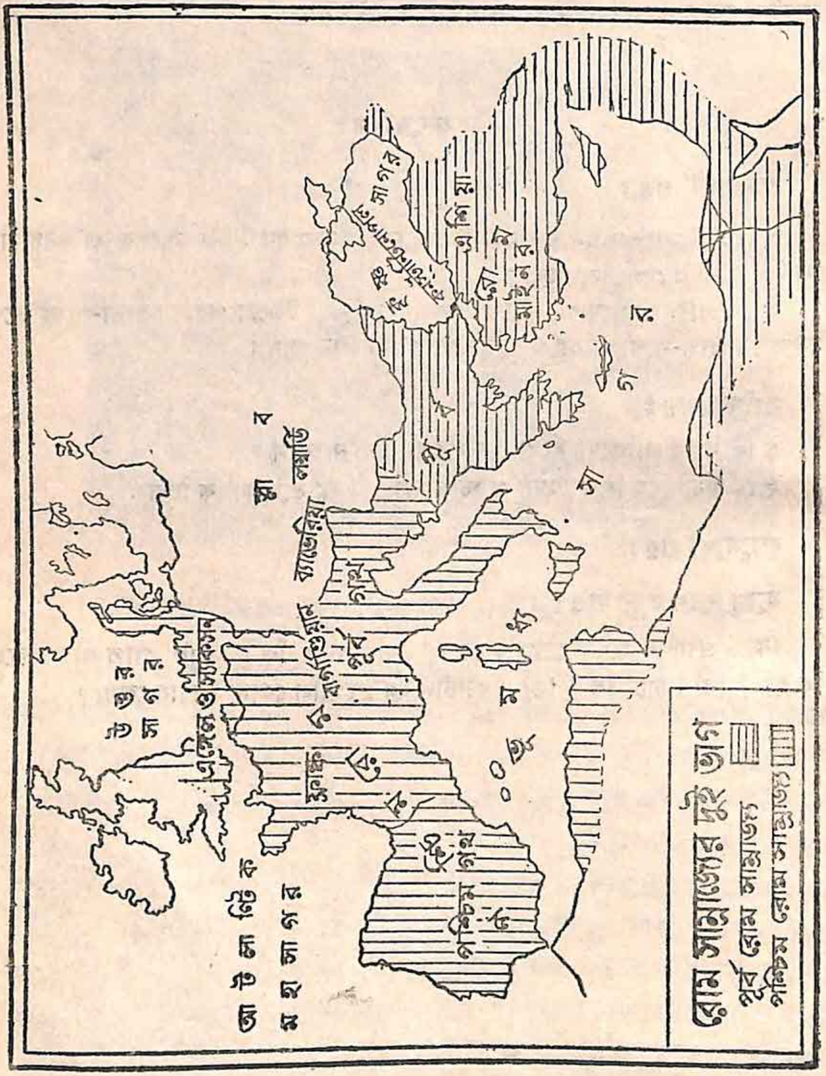
২। মধ্যযুগে শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের ভূমিকা কি ছিল ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক কে ? (খ) পাপ কি ? (গ) পাপ কাজ করলে কি হয় ? (ঘ) চার্চ কি ? (ঙ) খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থগুলি কোন্ ভাষায় লেখা ?

সুযোগ্য, শাসনদক্ষ ও রণকুশলী সম্রাটের শাসনের অভাবে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দুর্বল হতে শুরু করে। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। তারই সুযোগে একের পর



এক বর্বর জাতি এসে আক্রমণ চালায়। শেষ শক্তিমান রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্‌-টাইন রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে বাইজান্‌টাইনে এক নতুন নগরী স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে এই নগরীকে কেন্দ্র করে এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

ইতিহাসে এই সভ্যতা **বাইজানটাইনের সভ্যতা** নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য দু'ভাগ হয়ে যায়—**পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য**।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে বর্বর জাতির ক্রমাগত আক্রমণে ঐশ্বর্যশালী রোম নগরীর পতন হয়। কনস্টাণ্টিনোপল নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাইজানটাইনের সভ্যতা এর পরেও খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র হয় বাইজানটাইন। **বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর দেশ নিয়ে গড়ে ওঠা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিস্তার।** সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ছিল সুদূরপ্রসারী। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল গ্রীক। সেজন্য বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকে গ্রীক সাম্রাজ্যও বলা হয়। গ্রীক সভ্যতার প্রভাবে এখানকার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বাইজানটাইন সভ্যতার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় জানবার চেষ্টা করব।

(ক) **সম্রাট কনস্টানটাইনের কনস্টাণ্টিনোপল নগরী স্থাপন :** চারদিক থেকে বর্বর জাতিদের আক্রমণে যখন রোমান সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়—তখন দূরদর্শী রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন নতুন নগরী গড়ে তোলেন এবং ভাঙন এড়াবার চেষ্টা করেন। বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্যেই তিনি এরূপ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের শত্রু পারসীক, গথ ও হূণদের এই নগর থেকে বিতাড়িত করা সহজ ছিল। কনস্টাণ্টিনোপল ছিল বস্ফোরাস প্রণালীর দ্বারা সুরক্ষিত। কনস্টাণ্টিনোপলের অধিবাসীরা রোমের অধিবাসীদের ন্যায় গর্বিত ও প্রজাতান্ত্রিক ভাবাপন্ন ছিল না। মিশর ও ইউক্রেন থেকে এই নগরের লোকদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার সুযোগও কনস্ট্যানটাইনকে প্রভাবিত করে। কনস্টান্টিনোপলের পুরাতন নাম ছিল বাইজানটিয়াম। গ্রীকযুগে এই নগরী ছিল গ্রীক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। সুতরাং



সম্রাট কনস্ট্যানটাইন

এই শহরটি রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার উপযুক্ত ছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে এই শহরের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

এই সকল কথা মনে রেখে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন বাইজানটিয়াম নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

অতীতে বাইজানটাইন ছিল গ্রীক উপনিবেশ। এশিয়া-ইউরোপের সংযোগ-স্থলে ছিল এর অবস্থান। এই বাইজানটাইনেই কনস্ট্যানটাইন নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এই নগরীর নাম হয় **কনস্টাণ্টিনোপল**। এই কনস্টাণ্টিনোপল পরবর্তীকালে সমস্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়। রোম নগরীর পতনের পরেও এর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক থেকেই এই নগরী এক সময়ে মধ্যযুগের একটি শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

খ্রীস্টান ধর্মকে রাজকীয় অনুমোদন দান: সম্রাট কনস্ট্যানটাইন ছিলেন দূরদর্শী, বুদ্ধিমান ও বিবেচক। খ্রীস্টান ধর্মের উদ্ভবের পর থেকে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর খুব অত্যাচার করা হয়। এমনকি খ্রীস্টান ধর্মপ্রবর্তক মহান যীশুকে রোমান শাসকেরা নির্মমভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার আদেশ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তা সত্ত্বেও রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে শুরু করে। এই অবস্থায় সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন না চালিয়ে তিনি নিজেই এই ধর্মে দীক্ষিত হন। শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টান ধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়। কনস্ট্যানটাইন ভেবেছিলেন অত্যাচার কিংবা জোর করে খ্রীস্টান ধর্মের প্রসার রোধ করা সম্ভব হবে না। সেজন্য তিনি নিজে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও অন্তরের সাথে মেনে নিতে পারেননি। অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের অসাধারণ দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতারই পরিচয় মেলে।



সম্রাট জাস্টিনিয়ান

(খ) **সম্রাট জাস্টিনিয়ান:** বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও কনস্টাণ্টি-নোপল নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **জাস্টিনিয়ান**। তিনি ছিলেন ইলিরিয়ার এক সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতৃব্য জাস্টিন ছিলেন বুদ্ধিমান ও সমরকুশলী যোদ্ধা। তিনি তাঁর

প্রতিভাবলে কনস্টাণ্টিনোপলের সম্রাট হন। মৃত্যুকালে তিনি জাস্টিনিয়ানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। জাস্টিনের জীবিতকালে জাস্টিনিয়ান শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ও সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন।

জাস্টিনের মৃত্যুর পরে জাস্টিনিয়ান ৫২৭ খ্রীঃ অব্দে কনস্টাণ্টিনোপলের সম্রাট হন। যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন শিল্প ও স্থাপত্যের অনুরাগী। তাঁর সুদক্ষ শাসনে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সকল বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।

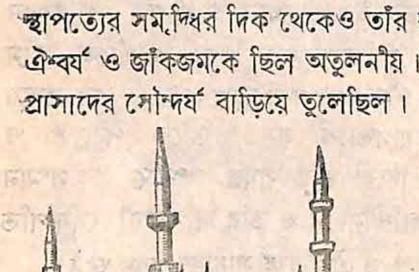
ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন : জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেই সাম্রাজ্যের মধ্যে শাসন, শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে বসার পর—"**নিকা**" বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। কনস্টান্টিনোপলের নাগরিকরা "নীল ও সবুজ" এই দুই উপদলে বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে মেতে ওঠে। অবশ্য এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এরপর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান। তাঁর সুবিখ্যাত সেনাপতি **বেলিসারিয়াসের** হাতে উত্তর-আফ্রিকার ভ্যাণ্ডালেরা পরাজিত হয়। এরপর বেলিসারিয়াস ইটালীতে অভিযান চালান। তখন ইটালী ছিল পূর্বগথদের অধিকৃত। প্রায় উনিশটি যুদ্ধের পর পূর্বগথেরা পরাজিত হয়ে জাস্টিনিয়ানের অধীনতা মেনে নেয়। তিনি ইটালী থেকে অস্ট্রোগথ এবং স্পেন থেকে ভিসিগথদেরও বিতাড়িত করেন। বেলিসারিয়াস ৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে রোম জয় করেন। পারস্য সম্রাটের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলে। এক সময়ে বেলিসারিয়াস সম্রাট জাস্টিনিয়ানের বিরাগভাজন হন। তাঁকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হয়। পরে অবশ্য মুক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমনিভাবে সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও তাঁর দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বেলিসারিয়াসের বীরত্বের ফলে এক বিশাল ও ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

জাস্টিনিয়ানের আইনবিধি ও তার গুরুত্ব : সম্রাট জাস্টিনিয়ানের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল রোমান আইন-কানুন প্রণয়ন। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রচেষ্টায় রোমান আইনকে সংকলিত ও বিধিবদ্ধ করে যে রূপ দেওয়া হয় ইতিহাসে তা **জাস্টিনিয়ান** ল-কোড নামে পরিচিত। তখন বিশাল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আইন-কানুন ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। জাস্টিনিয়ান বুঝেছিলেন, সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই রকম আইন-কানুন থাকা দরকার। তা না হলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি আইন-কানুন সংকলনের দিকে দৃষ্টি দেন।

রোমান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের শাসকেরা নিজেদের সুবিধা মত আইনের ব্যাখ্যা করতেন। বিশেষজ্ঞরা এযুগের মত সে যুগেও বিভিন্ন আইন-কানুন সম্পর্কে মতামত দিতেন। জাস্টিনিয়ানের ল-কোডে এ সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের ল-কোড এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টা। প্রাচীন যুগে ব্যাবিলন-রাজ হামুরাবির মতই মধ্যযুগের ইতিহাসে এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য জাস্টিনিয়ান অমর হয়ে আছেন। দেশ-বিদেশের আইনজ্ঞদের কাছে আজও রোমান আইন-কানুন আদর্শরূপে স্বীকার করা হয়। বর্তমানেও আইনের ছাত্রদের কাছে রোমান আইন অবশ্য পাঠ্য। আজও দেশ-বিদেশের বিচারকেরা মামলার রায় দেবার আগে রোমান আইনের বহু নির্দেশ অনুসরণ করেন। সুতরাং জাস্টিনিয়ানের সময়ে সংকলিত জাস্টিনিয়ানের ল-কোডের গুরুত্ব শুধু মধ্যযুগে নয়, বর্তমান যুগেও সমানভাবে স্বীকৃত। জাস্টিনিয়ানের আইনে খ্রীস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়। গীর্জার উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। নাগরিকদের অনেক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। উত্তরাধিকারের আইনকে শিথিল করা হয়।

জাস্টিনিয়ানের শিল্পানুরাগ : স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধি : সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। নানা দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। শিল্প ও স্থাপত্যের সমৃদ্ধির দিক থেকেও তাঁর রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজদরবার ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে ছিল অতুলনীয়। নানা দেশের শৌখিন শিল্পদ্রব্য রাজ-প্রাসাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছিল।



বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশের দিক থেকে জাস্টিনিয়ানের রাজ-প্রাসাদের কাছে নির্মিত **সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা** সে যুগের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গম্বুজ ও মিনারাবিশিষ্ট এই গীর্জার দেওয়ালে ছিল সুন্দর সুন্দর চিত্র। রঙ-বেরঙের পাথর, কাঁচ ও মণি-মাণিক্য এর শোভা বর্ধন করত। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জার অসাধারণ ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ছিল সে যুগের এক অভিনব সৃষ্টি।

শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে বাইজান্টাইনের গুরুত্ব : বাইজান্টাইন

সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল ছিল মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প ও বাণিজ্যনগরী। এই নগরীর ঐশ্বর্য গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। এই নগরীর সামনে সমুদ্র, অন্য পারে এশিয়া। বাণিজ্যের সুখ-সুবিধা ছিল প্রচুর। কালক্রমে এই নগরী সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দরে পরিণত হয়। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য-সাগর আর এশিয়া-ইউরোপের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থানের জন্য পূর্ব-পশ্চিমের বণিকেরা এখানে এসে হাজির হত।

বাইজানটাইনের পণ্য মিশর ও লোহিত সাগরের পথে **ইথিওপিয়া, ভারত, সিংহল** প্রভৃতি দেশে চালান যেত। এসব বণিক আবার তাদের দেশ থেকে এখানে নিয়ে আসত নানা রকমের মশলা, মূল্যবান পাথর ও ভেষজ দ্রব্য। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গেও বাইজানটাইনের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। চীন দেশ থেকে আনা গুটিপোকা থেকেই এখানে রেশম শিল্পের সূচনা হয়। রাশিয়া থেকে আসত মধু, মোম ও ক্রীতদাস। তখন কনস্টাণ্টিনোপল ছিল বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা এখানে জিনিসপত্র বেচাকেনা করতে আসত। নানা দেশের মানুষের যাতায়াতে কনস্টাণ্টিনোপল সর্বদা মুখর হয়ে থাকত।

বাইজানটাইনের শিল্পীদের জগৎ-জোড়া খ্যাতি ছিল। এখানকার শিল্পী-দের তৈরী সোনা, রূপা, মাণিক্য এবং রঙ-বেরঙের কাঁচের জিনিসপত্রের চাহিদা ছিল পৃথিবীর সর্বত্র। সম্রাটদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দৈনন্দিন জীবন তখন



বাইজানটাইন শিল্পের নিদর্শন

ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। সোনা ও রূপার কারুকার্য করা নীলাভ-লোহিত বর্ণের রাজপরিচ্ছদ সে যুগের শিল্পীদের এক অতুলনীয় সৃষ্টি। শিল্পীদের তৈরী রেশম ও কার্পাসের মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই সুন্দর।

সভ্যতার ধারক বাইজানটাইন : মধ্যযুগে কনস্টাণ্টিনোপল গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এক সময়ে এই বাইজানটাইন ছিল গ্রীক উপনিবেশ। তাই এখানে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হত। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে রোমান ভাষা, সাহিত্য, আইন ইত্যাদিরও চর্চা শুরু হয়। এর ফলে কনস্টাণ্টিনোপল গ্রীক ও রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চারদিকের ভাঙাগড়া সত্ত্বেও এখানকার জ্ঞানসাধক পণ্ডিতেরা সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন করতেন। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার বিদ্যার্থী তখন কনস্টাণ্টিনোপলে বিদ্যা শিক্ষা করতে আসত। কনস্টাণ্টিনোপল এসব পন্ডিতদের প্রভাবে জ্ঞানতীর্থে পরিণত হয়। গ্রীক-রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এই নগরী বহন করে। এখানকার রাজারাও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা ইত্যাদি শাস্ত্রের সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা নানাভাবে আনুকূল্য দেখান।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন : উপযুক্ত সম্রাটের অভাবে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ক্রমে দুর্বল হতে থাকে। এরই সুযোগে পারসিক, তুর্কী ও আরবীয়রা এসে কনস্টাণ্টিনোপলের সম্রাটদের সাথে অনবরত যুদ্ধ করতে থাকে। এরপর শুরু হয় গৃহবিবাদ। তার ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে দুর্ধর্ষ অটোমান তুর্কীরা এসে প্রবল আঘাত হানে। এতে কনস্টাণ্টিনোপল নগরীর পতন হয়। সমৃদ্ধিশালী বাইজানটাইনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় যুগেরও অবসান ঘটে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। কখন ও কিভাবে কনস্টাণ্টিনোপল নগরী স্থাপিত হয়েছিল ?
২। জাস্টিনিয়ানের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।
৩। জাস্টিনিয়ানের ল-কোড ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বাইজানটাইনের গুরুত্ব ও সমৃদ্ধির পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কনস্ট্যানটাইনের খ্রীস্টান ধর্মের স্বীকৃতি দান ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে অল্প কথায় লেখ।

২। জাস্টিনিয়ানের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে অনুরাগের পরিচয় দাও।

৩। সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক হিসাবে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অল্প কথায় লেখ।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকে — সাম্রাজ্যও বলা হয়। (খ) দূরদর্শী রোমান সম্রাট — নতুন নগরী গড়ে তোলেন এবং ভাঙন এড়াবার চেষ্টা করেন। (গ) — সাম্রাজ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান। (ঘ) সম্রাট — উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল রোমান আইন-কানুন —।

২। **সঠিক উত্তরটি খুঁজে চিহ্নিত (√) করে দেখাও ঃ—**

(ক) কনস্টাণ্টিনোপল নগরীর স্থাপয়িতা কে ?	(ক) সম্রাট কনস্ট্যানটাইন / জাস্টিনিয়ান
(খ) কনস্টাণ্টিনোপল কোথাকার রাজধানী ছিল ?	(খ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য / পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য
(গ) কোন প্রচেষ্টার জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ান মধ্যযুগের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন ?	(গ) রাজ্য জয় / আইন-প্রণয়ন
(ঘ) সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা কে নির্মাণ করান ?	(ঘ) কনস্ট্যানটাইন / জাস্টিনিয়ান

৩। **মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ**

(ক) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য কোন স্থানে গড়ে উঠেছিল ? (খ) বাইজানটাইন অতীতে কাদের উপনিবেশ ছিল ? (গ) কনস্টাণ্টিনোপল নগরী কে নির্মাণ করেন ? (ঘ) বেলিসারিয়াস কে ছিলেন ? (ঙ) জাস্টিন কে ছিলেন ? (চ) বাইজানটাইনে কোথা থেকে রেশমের গুটিপোকা আমদানি করা হয়েছিল ?

৫ ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার

যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে আরবদেশ। খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শ বছর পরে এখানেই উদ্ভব হয় **ইসলাম ধর্ম**। এই ধর্মের প্রচারক **হজরত মহম্মদ**। অতীতে এখানে মিশর, আবিসিনিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীক ইত্যাদি অঞ্চলের রাজারা দিগ্বিজয় চালিয়েছিলেন। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছাড়াও এখানে ইহুদীধর্মের বহু গোষ্ঠী বসবাস করত। ধর্মীয় মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আরববাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীও নিজস্ব পৌত্তলিকতাবাদ মেনে চলত এবং নানা রকম কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল।

আরবভূমিতে ধর্মীয় অধঃপতনের সংকটকালে হজরত মহম্মদের প্রচারিত ইসলামধর্মের বিকাশ দেখা দেয়। ধর্মকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার বিরাট অঞ্চলে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে ইসলাম সাম্রাজ্যে যে আলো জ্বলেছিল তাতে সমস্ত ইউরোপ আলোকিত হয়। মধ্যযুগের ইতিহাসে আরব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাই উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তারের সেই কাহিনী পাঠ করব।

আরব দেশ ও দেশবাসী: এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ। এদেশের অধিকাংশই অনুর্বর, মরুময় ও বসবাসের অযোগ্য। এর তিন দিকে সমুদ্র আর একদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মরু-প্রান্তর। সমুদ্রতটে আছে স্বল্প পরিসর উর্বরভূমি, কয়েকটি ছোটে নদী এবং মরূদ্যান। চারদিকে খেজুর গাছের সারি। তারই মাঝখানে ছোট ছোট নগর, গ্রাম আর জনপদ। এখানকার অধিবাসীরা কষ্ট-সহিষ্ণু ও কঠোর পরিশ্রমী। এই আরব দেশের এক পাশে প্রাচীন সুমেরীয় ও ব্যাবলনীয় সভ্যতার উদয় হয়েছিল। এককালে এর উত্তরে ছিল ফিনিশিয় ও ইহুদীর বাসস্থান। ফিনিশিয় ও ইহুদীদের মত আরবেরাও ছিল একই সেমেটিক জাতি। আরবেরা **বাদালী** ও **বেদুইন**—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যারা গ্রাম ও নগর থেকে চাষবাস, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত তারা হল **বাদালী**। তারা উটের পিঠে চড়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। উটের পিঠে বোঝা চাপিয়ে তারা মরুভূমি পার হত বা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তারা পূর্বে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে রোমের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

মরুবাসী আরবদের বলা হত **বেদুইন**। তারা ছিল পুরোপুরি যাযাবর। তারা ঘোড়া ও উট পালন করত এবং এদের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত। তারা কখনও কখনও মরুভূমিতে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করত, অথবা উটের পিঠে শুয়ে রাত কাটাত। এদের পানীয় ছিল উটের দুধ আর খাদ্য ছিল খেজুর। যখন কিছুই

জুটত না তখন বেদুইনরা দস্যুবৃত্তি চালাত। মরুযাত্রী বণিকদের অসহায়তার সুযোগে তারা তাদের সব কিছু লুট করে নিত।

আরবেরা বহুগোষ্ঠী বা জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে সবসময় কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। গোষ্ঠীর দলপতিকে বলা হত **শেখ**। শেখেরা ছিলেন অসামান্য ক্ষমতাশালী। গোষ্ঠীর সকলেই তাঁদের মান্য করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। মাটির মূর্তি তৈরী করে তারা পূজা করত। দেবতাদের প্রাধান্য নিয়ে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রায়ই বিরোধ চলত। আরব সমাজে তখন পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। মক্কা ছিল আরব জাতির নিকট



কাবা মসজিদ

পবিত্র তীর্থস্থান। কারণ আদিপিতা আদমের উপাসনা-গৃহ 'কাবা' এই মক্কাতেই অবস্থিত। কাবা-উপাসনালয়ে একটি কালো পাথর আছে যার নাম হল হাজ্রে আসওয়াদ। এই পাথরটি আদিপিতা আদম ও ধর্মপ্রচারক হজরত ইব্রাহিমের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে বর্বর আরবজাতি তাদের গোষ্ঠীর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি এই কাবা গৃহে রেখে উপাসনা করত।

আরবেরা প্রতি বছর মক্কায় তীর্থ করতে যেত। দূর-দূরান্তর থেকে এখানে এসে সকলে মিলত। সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে আরবেরা নিজেদের ভাষায় যুদ্ধের গান ও প্রেমগীতি রচনা করত, কবিতা আবৃত্তি করত ও গান গাইত। প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরত এই কাব্য ও গান। আরবদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। পরম সমাদরে তারা অতিথি সৎকার করত।

হজরত মহম্মদ : জীবন ও বাণী : মক্কার কাবা মসজিদের প্রধান ছিল **কোরেশ বংশ**। এই বংশেই ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রচারক **হজরত**

মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম **আবদুল্লা,** মা **আমিনা**। জন্মের আগেই হজরতের বাবা মারা যান। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা-ও মারা যান। মাত্র ছয় বছর বয়সের অনাথা মহম্মদের শৈশব জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশায় ভরা। এ সময়ে তাঁর পিতৃব্য **আবু তালেব** তাঁকে লালন-পালন করেন।

ছোট বেলায় মাঠে মাঠে মেষ চরিয়ে মহম্মদের দিন কেটেছিল। তাই তিনি লেখাপড়া শেখার মত কোন সুযোগ পাননি। বড় হয়ে তিনি ব্যবসা করতে মিশর, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে যান। এর ফলে ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মহম্মদের মেলামেশা করার সুযোগ হয়। পঁচিশ বছর বয়সে **খাদিজা** নামে একজন ধনী ও বিধবা মহিলাকে মহম্মদ বিবাহ করেন। তার ফলে তিনি প্রচুর অর্থ ও সম্পদের অধিকারী হন। কিন্তু এই ঐশ্বর্য মহম্মদের মনে সুখ দিতে পারেনি। ধর্মের নামে পুরোহিতদের অনাচার, ধনীদের ধনের অপরিমিত ব্যয় এবং দরিদ্রের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, সর্বোপরি ধর্মের নামে কুসংস্কার মহম্মদকে ব্যথিত ও বিচলিত করে তোলে। তিনি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়ের কথা চিন্তা করেন। হিরা নামক পর্বত গুহায় ধ্যানে ও উপবাসে স্রষ্টার উদ্দেশ্য চিন্তায় তাঁর দিন কাটে। একদিন তিনি ঈশ্বরের আদেশ লাভ করেন। স্বর্গের দূত এসে তাঁকে সে আদেশের কথা জানান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ্—আল্লাহ্ই এক ও অদ্বিতীয় প্রভু। মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর বা আজ্ঞাবাহক। এই বাণী বয়ে নিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব : হজরত মহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শব্দের অর্থ—ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। আল্লা বা ঈশ্বর একজনই আছেন। তাঁর কোন আকার নেই। আল্লার কাছে আদেশস্বরূপ মহম্মদ যা লাভ করেছিলেন সেসব একত্রে **কোরাণ** নামক গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে কোরাণ হল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ—হিন্দুদের যেমন বেদ, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, খ্রীস্টানদের বাইবেল ঠিক তেমনি। কোরাণে প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচটি প্রাথমিক অবশ্য বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন—(১) আল্লাহ্‌কে একমাত্র প্রভুরূপে বিশ্বাস করা, (২) দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নমাজ পাঠ, (৩) রমজান মাসে উপবাস এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (৪) জীবনে একবার মক্কায় হজ্ বা তীর্থযাত্রা ও (৫) আয়ের আড়াই শতাংশ দরিদ্রশ্রেণীকে দান করা।

ইসলাম ধর্ম জাতিভেদ কিংবা পুরোহিতদের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইসলামের বাণী চিরসাম্যের বাণী। এ ধর্ম ধনী-দরিদ্রের ভেদ মানে না। একজন সম্রাটের সঙ্গে তাঁর অনুগত দীন-দরিদ্র ব্যক্তিও একই সাথে নমাজ পড়তে

পারে। এতে একের সঙ্গে অন্যের কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। হজরত মহম্মদ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কারেরও গুরুত্ব দেন। মদ্য পান, সুদ গ্রহণ ইত্যাদি ইসলাম ধর্মে পাপ হিসেবে ধরা হয়।

ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও তার অসুবিধা : হিরা নামক পর্বতে কঠোর তপস্যার পরে মহম্মদ চল্লিশ বছর বয়সে আল্লার আদেশ লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের বিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রথমে মহম্মদের স্ত্রী খাদিজা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর তাঁর বিশ্বস্ত সহচর আবুবকর, জ্ঞাতিভাই আলী প্রভৃতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মক্কার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ওমর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এ ছাড়া বহু ক্রীতদাস ইসলাম ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমনি করে ইসলাম ধর্মের বিস্তার হতে শুরু করে।

মহম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মের জনপ্রিয়তা মক্কার কোরেশি বংশীয়দের বিরূপতার কারণ হয়। তারা কিছুতেই মহম্মদের প্রাধান্য স্বীকার করতে পারছিল না। সেজন্য তারা মহম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। মহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। শত্রুদের ষড়যন্ত্র অনুমান করতে তাঁর বেশি দেরি হয়নি। তাই তিনি একদিন রাতের অন্ধকারে বিশ্বস্ত অনুচর আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। মদিনা ছিল মক্কার মত আরবের একটি শহর। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ছিল বহু খ্রীস্টান ও ইহুদী। তারা দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করার বিরোধী ছিল। সেজন্য মক্কার সাথে মদিনার শহরবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। মদিনাবাসীরা মহম্মকে তাই সাদর আমন্ত্রণ জানাল। তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করেন। মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা গমনের ঘটনা ঘটেছিল ৬২২ খ্রীস্টাব্দে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই বছরটি স্মরণীয়। সেজন্য মহম্মদের দেশত্যাগকে মুসলমানেরা বলেন **হিজরত**। আর ঐ দিন থেকে যে বছর গণনা শুরু হয় তাকে বলে **হিজরী সন**। মদিনাবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে মহম্মদ নতুন উৎসাহে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাদল গড়ে তোলেন। সৈন্যরা সকলেই ছিল ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এমনিভাবে শক্তি সঞ্চয় করার পরে মহম্মদ মদিনাবাসীদের সাহায্য নিয়ে ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে মক্কা জয় করেন। মক্কায় প্রবেশের পরে তিনি সেখানকার সাধারণ মানুষের ওপর কোন অত্যাচার করেননি। মক্কার মন্দিরের সব দেবমূর্তি তিনি ধ্বংস করেন। এর পর একে একে আরবের অধিকাংশ উপজাতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারা সকলেই মহম্মদের শাসন ও ধর্ম গ্রহণ করে।

মহম্মদের জীবিত কালে কনস্টাণ্টিনোপল, আবিসিনিয়া, পারস্য ও চীনে ইসলামের দূত প্রেরণ করা হয়। **সম্রাট হেরাক্লিয়াসের** সঙ্গে যুদ্ধের ফলে আরব সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলও তাঁর অধিকারে আসে। এভাবে ইসলামের জয়যাত্রার পথ সুগম করার পরে ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়।

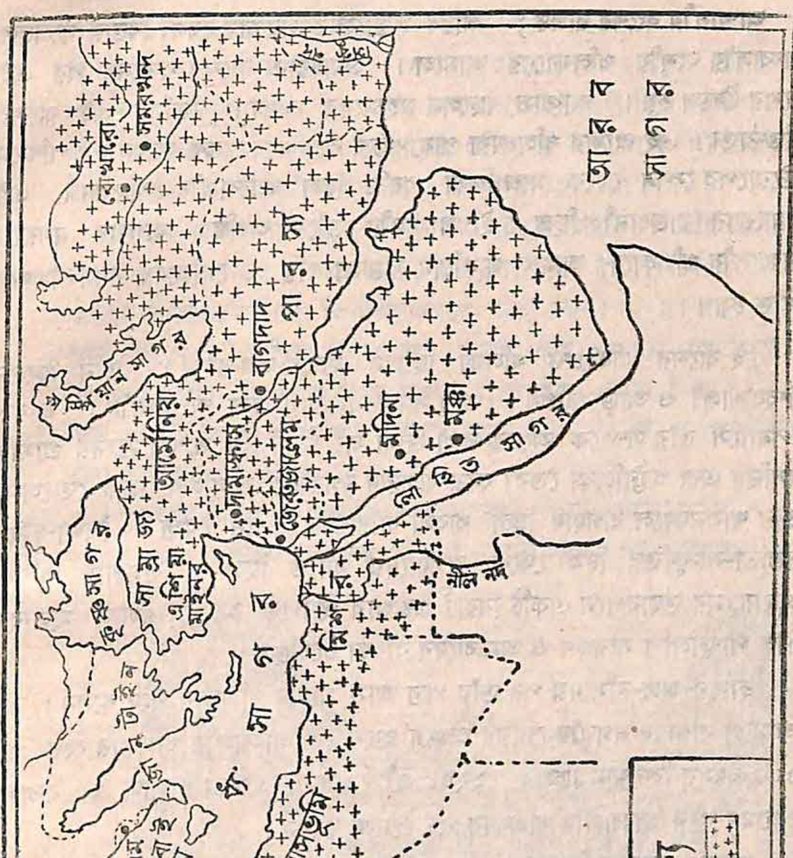
খলিফাদের কথা ঃ মহম্মদের পর ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং সব ধর্মীয় কাজ করার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত হয় তাঁদের বলে **খলিফা**। খলিফারা ছিলেন ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর **আবুবকর, ওমর, ওসমান** ও **আলী**—পর পর এই চারজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি খলিফার পদে বসেন। উদারতা, ধর্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ইত্যাদি মহৎ গুণের জন্য এসব খলিফার যুগকে বলে **ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগ**। এঁদের চার জনের অসাধারণ রণচাতুর্যের ফলে ইসলাম সাম্রাজ্য পারস্য, মিশর, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়।

প্রথম খলিফা **আবুবকর** মহম্মদের বিশ্বস্ত অনুচর ও নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল সরল, আদর্শনিষ্ঠ ও অনাড়ম্বর। **দ্বিতীয়** খলিফা **ওমর** আহার-বিহারে, আচার-আচরণে ছিলেন আদর্শপরায়ণ। তাঁর সময়ে খ্রীস্টান ধর্মতীর্থ জেরুজালেমে একটি মসজিদ তৈরী হয়। **তৃতীয়** খলিফা **ওসমান** কোরাণের বাণীকে বর্তমান অবস্থায় সন্নিবেশিত করেন। তাঁর সময়ে আরবে গৃহবিবাদের সূচনা হয়। কোরাণ পাঠরত অবস্থায় ওসমান আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। **চতুর্থ** খলিফা **আলীর** সময় আরবে খলিফা পদের অধিকারকে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসম্বাদ চরম আকার নেয়। আলীর আত্মীয় ছিলেন **মোয়াবিয়া**। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলীর বিবাদ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আলী গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

আলীর পরে **পঞ্চম** খলিফা **হন মোয়াবিয়া**। তার পর খলিফার পদ বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। এই বংশের নাম **উমাইয়াদ বংশ**। আলীর দুই ছেলে হাসান ও হোসেন। এঁরা ছিলেন হজরত মহম্মদের দৌহিত্র। একদল তাঁদের পক্ষ নিল খলিফা পদের জন্য। উমাইয়াদ খলিফার পদ ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এই নিয়ে শুরু হল বিবাদ। তারা প্রথমে আলীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করল, তারপর হোসেনের প্রাণ নেবার জন্য নতুন করে চক্রান্ত শুরু করল।

মোয়াবিয়ার পরে **এজিদ** দামাস্কাসে খলিফার পদে বসেন। একদল লোক এজিদকে মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। তারা চাইছিল হোসেনকে খলিফার পদে বসাতে। হোসেন তাই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে মক্কা থেকে সপরিবারে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে এজিদের অনুগত কুফার শাসক **কারবালার প্রান্তরে** হোসেনের গতিরোধ করলেন। হোসেন যুদ্ধ করে সদলে প্রাণ হারান।

তাঁর দুই পুত্র এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শত্রুর হাতে নিহত হন। সেদিন ছিল মহরম মাসের দশম দিন। সমস্ত মুসলিম জগৎ এই ভয়াবহ মৃত্যুর ঘটনায় গভীরভাবে



শোকাভিভূত হল। হোসেনের মৃত্যু কাহিনী স্মরণ করে আজও একশ্রেণীর মুসলমান মহরম পালন করে থাকেন। এই ঘটনার পর থেকে মুসলিম সম্প্রদায়

হজরত বংশধরদের খিলাফতে বিশ্বাসী **শিয়া** এবং তার প্রতিপক্ষ **সুন্নী** এই দুই ভাগে বিভক্ত হল।

আব্বাসীয় বংশের রাজত্ব ঃ আরব সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশী বিস্তার ঘটেছিল আব্বাসীয় বংশীয় খলিফাদের আমলে। উমাইয়াদ বংশের পতনের পর এই বংশের উদ্ভব হয়। আব্বাস ছিলেন মহম্মদের কাকা। তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের খলিফারা প্রায় পাঁচশ বছর ধরে রাজত্ব করেন। পশ্চিমে ইউরোপের স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত ছিল আব্বাসীয় সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত **বাগদাদ নগরী**। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য শক্তি ও গৌরবের চরম শিখরে উন্নীত হয়।

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন **হারুণ-অল-রসিদ**। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যশালী ও আড়ম্বরপ্রিয়। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ছিল অপরিসীম। আরব্য উপন্যাসে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। তিনি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ এবং অট্টালিকা তৈরী করে বাগদাদ নগরীকে সুসজ্জিত করে তোলেন। তাঁর শাসনকালে বাগদাদ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে বাগদাদের খ্যাতি ছিল। বাগদাদে পণ্ডিত হুমায়ুনের তত্ত্বাবধানে একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এখানে মূল্যবান গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছিল।

হারুণ-অল-রসিদের পর তাঁর পুত্র আল মামুদ খলিফার পদে বসেন। তাঁর আমলে বাগদাদ নগরীর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। আব্বাসীয় খলিফার বংশ প্রায় ৫০০ বৎসর বিদ্যমান ছিল। ১২৫৮ খ্রীঃ মোঙ্গল বিজেতা হালাদু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করে আব্বাসীয় খলিফার পদ উচ্ছেদ করেন।

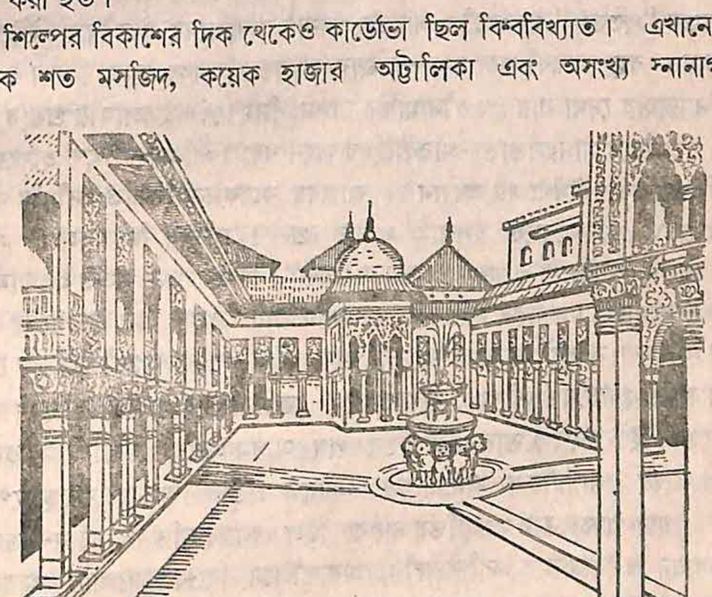
আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ আরব সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। হজরদ মহম্মদের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে এই সাম্রাজ্য পূর্বে ভারতের সিন্ধু দেশ থেকে পশ্চিম ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্পেন, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, সিন্ধুদেশ ও মধ্য এশিয়া জুড়ে ছিল এই সাম্রাজ্যের বিস্তার। এর সর্বত্রই ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। নানা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে আরবদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে।

স্পেনে ইসলামের বিজয় ঃ কার্ডোভা নগরী ঃ আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে পশ্চিম ইউরোপের স্পেনে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এই সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান কৃতিত্ব আফ্রিকার মরক্কো নিবাসী মুরদেরই প্রাপ্য।

তারাই স্পেনের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। স্পেনে ইসলাম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক যোগসেতু রচিত হয়। মধ্যযুগের সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ দিক তাকে ধারণ করেছিল ইসলাম। সুতরাং ইউরোপের ইসলামের প্রভাবে দেখা দিল এক নতুন জীবন-স্পন্দন। ধর্মীয় দিক থেকে ইউরোপ ছিল খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী-দের অধিকারভুক্ত। স্পেনে ইসলামের প্রতিষ্ঠায় ইউরোপে খ্রীস্টান ধর্ম ছাড়াও ইসলাম ধর্ম একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিল।

স্পেনে আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা **আব্দুর রহমান**। তাঁর সময়ে **কার্ডোভা** নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নগরী ছিল সে যুগের শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এখানে ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জ্ঞানী-গুণীরা এসে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এসে এখানে লেখাপড়া শিখত। এখানকার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান। কার্ডোভাতে ছিল একটি বিরাট গ্রন্থাগার। তাতে বহু মূল্যবান বই ও পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করা হত।

শিল্পের বিকাশের দিক থেকেও কার্ডোভা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। এখানে ছিল কয়েক শত মসজিদ, কয়েক হাজার অট্টালিকা এবং অসংখ্য স্নানাগার।



আলহামরা রাজপ্রাসাদ

কার্ডোভার কাছেই ছিল অসংখ্য স্তম্ভ ও খিলানবিশিষ্ট **জহরা প্রাসাদ**। কার্ডোভার মত স্পেনের আরব সাম্রাজ্যে **গ্রানাডা** নামে আর একটি বিখ্যাত নগরী ছিল

এখানকার **আলহামরা** রাজপ্রাসাদ অতুলনীয় শোভা, সৌন্দর্য এবং জাঁকজমকে পূর্ণ ছিল। এটি সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত এবং প্রস্তর শিল্পের একটি অতুলনীয় নিদর্শন। গ্রানাডাতেও সাহিত্য এবং দর্শনের চর্চা হত। শিল্পকলার দিক থেকেও এই নগরের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ইসলামের সাফল্যে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া : সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পাঁচ শত বৎসর ইসলাম ধর্ম প্রবল বেগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপের স্পেন ও সিসিলি কিছুকালের জন্য ইসলামীয় অধিকারে চলে যায়। রোমের পোপ ইউরোপের খ্রীস্টানগণকে তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য আহ্বান জানান। ফলে, খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপের সীমান্ত থেকে ইসলামকে বহিস্কার করে খ্রীস্টধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইসলামের সংস্পর্শে এসে ইউরোপের জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও শিল্পে বহু পরিবর্তন আসে। গ্রীসের দার্শনিক চিন্তাধারা **ইবনরুসদের** মধ্য দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে। শূন্য দ্বারা সংখ্যা গণনাও ইউরোপীয়রা আরবীয়দের নিকট থেকে শিক্ষা করে। বীজগণিতও আরবীয়গণই তাদের প্রথম শিক্ষা দেয়। সংস্কৃতের "পঞ্চতন্ত্র" গল্পগুলি আরবীয় ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপে পৌঁছায়। বহু আরবী শব্দ যথা—বাজার, সরবত, সিরাপ, জার, সোফা প্রভৃতি ল্যাটিন ভাষায় দেখা যায়। চীনামাটির বাসন নির্মাণেও ইসলামীয় প্রভাব দেখা যায়। এভাবে মানবসভ্যতা আরবীয়দের দানে বহুল পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে।

বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের অবদান : আরবের কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর কথা : আরব জাতি দূর-দূরান্তে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিল। সুদূর চীন থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী দেশ স্পেন পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। নতুন সাম্রাজ্য জয়, বাণিজ্যের বিস্তার এবং ইসলামের প্রচার করেই আরবরা সন্তুষ্ট হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়ও তারা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। আরব জাতি প্রাচ্যের (এশিয়া মহাদেশের) জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরণ করে পাশ্চাত্যে (ইউরোপে) তার বিস্তৃতির পথ সুগম করে। গ্রীক সাহিত্যের অনেক গ্রন্থই আরবীয়রা অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির বাহক ছিল আরবজাতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলনে বিশ্বের দরবারে আরবদের অবদান অসামান্য।

আরব সভ্যতার অতুলনীয় সমৃদ্ধির মূলে ছিল গ্রীক, পারসিক, ইহুদী, ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব। বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চায় আরবেরা ছিল অগ্রণী। গণিতশাস্ত্রের তারা স্রষ্টা। তাদের সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি আজও অনুসৃত হয়। ভারতীয় গণিতবিদ্যার প্রভাবে আরবেরা প্রাচ্যে

দশমিক গণিতের প্রচার করে। **ইউক্লিডের** জ্যামিতির উপর ভিত্তি করে তারা গড়ে তোলে নতুন জ্যামিতি। আধুনিক বীজগণিত আরবদেরই সৃষ্টি। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে আরবে জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপক চর্চা হত। গ্রীক ও আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে আরবীয়রা নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞান গড়ে তোলে। **আবুসিয়া** নামে এক মনীষী চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি সংকলন করেন। রসায়নশাস্ত্রের অনেক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারক আরবীয়রা। ইতিহাস অনুশীলনেও আরবীয়রা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করে।

আরব দেশের কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবদের অতুলনীয় অবদানের মূলে ছিল কয়েকজন মনীষীর বিরাট অবদান। অল্প কথায় আমরা এখানে তাঁদের সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করব।

আলকিন্দি ছিলেন একজন বিখ্যাত আরবীয় পণ্ডিত। তিনি দর্শন, গণিত, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রায় দু'শটি বই লিখেছিলেন। **ইবনে সিনা** ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিকিৎসক। গ্রীকদর্শন ও ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনিও প্রায় এক শতটি বই লিখেছিলেন। **ইবনে রুশদ** ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। কার্ডোভায় তিনি শিক্ষকতা করতেন। গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিস্টটলের গ্রন্থের তিনি আরবীয় অনুবাদ করেন। **আলতাবির** ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। তিনি সে যুগে পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। আর একজন ঐতিহাসিক **ইবনে খলদুন**। তিনি আরব, পারস্য ও আফ্রিকার মুসলিম জাতির ইতিহাস রচনা করেন।

আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে **আলবেরুনীর** নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের সময়ে দশম শতকে ভারতে আসেন। ভারতীয় ভাষা, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম ছিল **'তহকিক-ই-হিন্দ''**। সেই গ্রন্থ থেকে তখনকার ভারতবাসীর উন্নত জীবনধারা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। **তালতবারী** নামে আর এক আরব পণ্ডিত সৃষ্টির আদিকাল থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। মরক্কো নিবাসী **ইবন বতুতা** ছিলেন জাতিতে মুর, ধর্মে মুসলমান। সুদূর আফ্রিকা থেকে তিনি ভারতে আগমন করেন এবং বহুদিন ভারতে বাস করেন। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাঁকে কাজী নিযুক্ত করেন। তিনি নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী **সফরনামা** থেকে মধ্য-যুগের নানা দেশের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। সুলতানী আমলে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার কথা জানতে

হলে তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে হয়। এমনকি আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কেও অনেক কথা ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে লেখা আছে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। হজরত মহম্মদের জন্মের আগে আরবদের সামাজিক জীবনধারা কেমন ছিল ?

২। হজরত মহম্মদের ধর্ম প্রচারের আগে আরব জাতির ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৩। মহম্মদের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। ইসলাম ধর্মের বিস্তার হয়েছিল কেমন করে ?

৫। ধর্মপরায়ণ খলিফাদের যুগ সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৬। আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের অবদান সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আরবদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে কি জান ?

২। কাবার মসজিদ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। কোরাণ কি ? এতে কি কি বিশেষ পাঁচটি বিধি আছে ?

৪। খলিফা হারুণ-অল-রসিদ সম্পর্কে কি জান ?

৫। কার্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিবরণ দাও।

৬। আলবেরুনী ও ইবন বতুতার পরিচয় দাও।

৭। কারবালার ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল ?

৮। ইসলামের সাফল্যে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া কি ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ**

(ক) এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে আরবদেশ। (খ) ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে আরবরা একেশ্বরবাদী ছিল। (গ) পঁচিশ বছর বয়সে মহম্মদ নবধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। (ঘ) হজরত মহম্মদের মাতার নাম ছিল খাদিজা। (ঙ) প্রথম খলিফা ওমর ছিলেন বীর, ধীর ও জ্ঞানী।

২। **সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের কর ও (√) চিহ্নিত করে দেখাও ঃ**

(ক) হজরত মহম্মদ প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন (ক) মক্কায় / মদিনায়

(খ) হজরত মহম্মদের জন্ম হয় (খ) ৫৭০ খ্রীঃ / ৬৩০ খ্রীঃ

(গ) আফ্রিকাবাসী মুসলমান পর্যটক ছিলেন (গ) আলবেরুনী / ইবন বতুতা

(ঘ) আরব পণ্ডিতদের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন (ঘ) ইবনে সীনা / ইবনে খলদুন

৩। মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) আরবদেশের দুটি প্রাচীন নগরীর নাম কর। (খ) হিজরী সন কবে থেকে গণনা করা হয় ? (গ) ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কি ? (ঘ) খলিফা কাদের বলা হত ? (ঙ) কার্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ খলিফাদের কীর্তি ? (চ) হারুণ-অল-রসিদ কে ছিলেন ? (ছ) আরব পণ্ডিতদের মধ্যে কে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন ? (জ) ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কয়টি ভাগে বিভক্ত ও কি কি ?

৬ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০০-১২০০ খ্রীস্টাব্দ)

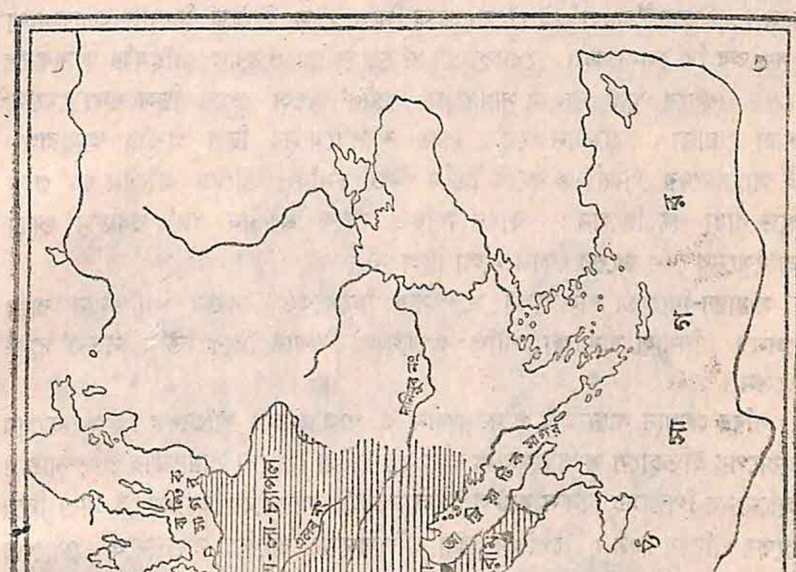
(ক) আমরা বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের কাহিনী আগের একটি অধ্যায়ে পাঠ করেছি। বর্বর জাতিদের আক্রমণোত্তর ইউরোপে জাস্টিনিয়ান ছিলেন অন্ধকার যুগের নতুন আলো। জাস্টিনিয়ানের পরবর্তীকালে আরও একজন পরাক্রান্ত রাজার নাম বিশেষভাবে করতে হয়। তিনি হলেন **চার্লস** বা **শার্লামেন**। শার্লামেন ছিলেন ফ্র্যাঙ্কদের রাজা। আমরা আগেই জেনেছি, এই ফ্র্যাঙ্করা হল জার্মান বর্বর জাতির একটি শাখা। ফ্র্যাঙ্কদের রাজারা সপ্তম শতকে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রধান সচিব ছিল **নগরপাল** বা **মেয়র**। এঁরাই সত্যিকারের দেশের শাসন চালাতেন। অষ্টম শতকে **পেপিন** নামে একজন মেয়র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি দুর্বল ফ্র্যাঙ্কদের রাজাকে সরিয়ে নিজেই সিংহাসনে বসেন। পেপিনের প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হল **ক্যারোলিঙ্গিয়ান বংশ**। ক্যারোলিঙ্গিয়ান বংশের রাজারা ধর্মীয় প্রধান পোপের অনুমোদন লাভ করেন। রাজারা হলেন ভগবানের প্রতিনিধি—এ ধারণা এ সময় থেকেই গড়ে ওঠে। পেপিনের পরে এই বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি শার্লামেনের রাজত্বকালে খুবই বৃদ্ধি পায়।



সম্রাট শার্লামেন

শার্লামেন (৭৬৮-৮১৪ খ্রীঃ) : শুধু ফ্র্যাঙ্কদের নয়, মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শার্লামেন। তিনি ছিলেন অসীম শক্তিধর, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। মধ্য যুগে রাজা আর্থারের কাহিনী খুবই জনপ্রিয় ছিল। শার্লামেন সেই গল্পে বর্ণিত রাজা আর্থার। তাঁকে নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। তাঁর গায়ে ছিল ভীষণ জোর। তিনি নাকি তরবারির এক ঘায়ে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে কেটে ফেলতে পারতেন। শার্লামেনের সভাসদ ছিলেন **এজিনহার্ড** নামে একজন পণ্ডিত। তাঁর লেখায় শার্লামেন সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ দেওয়া আছে। শার্লামেনের চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল, মুখে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি আর স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি তোমাদের মতই কৌতূহলী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল খুবই বেশী।

সাম্রাজ্য-বিজেতা শার্লামেন : শার্লামেন ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা। সাম্রাজ্য-বিজেতা হিসেবে মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনি খ্যাতি ও অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বকালে পঞ্চাশটিরও বেশী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদল ছিল অপরাজেয়। বর্তমান



ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী, উত্তর ইটালী, উত্তর স্পেন প্রভৃতি অঞ্চল ছিল শার্লামেনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম জার্মানীর স্যাক্সনেরাও তাঁর কাছে পরাজিত হয়। শার্লামেনের বিজয়-বাহিনী

একবার পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেনে অভিযান চালায়। স্পেন তখন ছিল ইসলামধর্মী মুরদের অধিকারে। স্বদেশে ফিরে আসার সময়ে ফ্র্যাঙ্ক সৈন্যরা পার্বত্য জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ সময়ে **রোলান্ড** নামে এক বীর যোদ্ধা ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর সেনানায়ক। তিনি এই অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারান। পরবর্তীকালে এই রোলান্ডকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত শোকগাথা—**সঙ অব দি রোল্যান্ড**। বোহেমিয়া ও বেভারিয়াও ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর অধিকারে আসে। এভাবে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল শার্লামেনের বিশাল সাম্রাজ্য। খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি শার্লামেনের ছিল গভীর অনুরাগ। তাই স্যাক্সনদের পরাজিত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি ; তাদের খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ বিজিত দেশে খ্রীস্টান ধর্ম প্রবর্তন ছাড়া শার্লামেনের দেশ জয়ের কোন মূল্য ছিল না।

সাম্রাজ্য-বিজেতা শার্লামেন সুশাসক হিসেবেও একজন খ্যাতিমান রাজা ছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান ও শার্লামেনের অভিষেক ঃ মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে শার্লামেনকে বলা হয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শার্লামেনের পিতামহ **চার্লস মর্টেল** ইসলামধর্মী আরবদের আক্রমণকে বাধা দিয়ে বীরত্বের পরিচয় দেন। **পেপিন** ক্যারোলিঙ্গিয়ান বংশের রাজপদকে পোপের অনুমোদিত করিয়ে নিয়েছিলেন। পিতা ও পিতামহের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন শার্লামেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সদ্য-বিজিত দেশ-গুলিতে খ্রীস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচার চালান। রোমান চার্চের পোপ এবং শার্লামেন উভয়েই খ্রীস্টান ধর্মের পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শার্লামেন জার্মান হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র রোমনগরী ও খ্রীস্টান ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। এ সময় খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপ রোমেই বাস করতেন। বর্বর জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়া রোম নগরীর ধর্মীয় গৌরব বহুকাল অটুট ছিল। খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপের বিরোধিতা করার জন্য শার্লামেন লোম্বার্ডি-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁর বিজয় বাহিনীর হাতে লোম্বার্ডির **ডেসিডেরিয়াস** পরাজিত ও বন্দী হন। এতে পোপ শার্লামেনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন।

শার্লামেনের অভিষেক ঃ শার্লামেনের রাজপদ খ্রীস্টান ধর্মজগতের সর্ব-নিয়ন্তা পোপের অনুমোদনের ঘটনা মধ্যযুগের ইতিহাসে **শার্লামেনের অভিষেক** নামে খ্যাত। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিন। আমরা জানি, ২৫শে ডিসেম্বর হল

বড়দিন বা এক্সমাস ডে। খ্রীস্টানদের কাছে এটি পবিত্র দিন। কারণ এ দিনটি হল খ্রীস্টান ধর্মপ্রবর্তক মহান যীশু খ্রীস্টের জন্মদিন। সেদিন সম্রাট শার্লামেন নতজানু হয়ে সেণ্ট পীটার গীর্জায় প্রার্থনারত ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন পোপ তৃতীয় লিও। তিনিই ছিলেন সে সময়কার খ্রীস্টান ধর্মজগতের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি—রোমান চার্চের পোপ। পোপ সেখানে উপস্থিত হয়ে শার্লামেনের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। আর উপহার দেন রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি ঘোষণা করেন, 'শার্লামেন হলেন পবিত্র



পোপ তৃতীয় লিও শার্লামেনের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন

রোমান সম্রাট'। সেণ্ট পীটার গীর্জার প্রাঙ্গণে সমবেত জনতা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। তখন থেকেই রোমান সাম্রাজ্য আবার **পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য** নামে অভিহিত হয়। কারণ নানা বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য অপবিত্র হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পোপ তাই ফ্র্যাংকদের রাজা শার্লামেনের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যকে পবিত্র করেন। শার্লামেন হলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট।

শার্লামেন তাঁর রাজধানী **আকিনের** নামকরণ করেন **'নতুন রোম'**। রোমের মতই সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ আর গীর্জা দিয়ে এই নগরীকে তিনি সমৃদ্ধশালী করে তোলেন। এভাবে রোম নগরী ও খ্রীস্টান ধর্মের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শার্লামেনের সাম্রাজ্য হল **পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য**। শার্লামেনের সুযোগ্য শাসনে একদিকে যেমন রোমের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার হয় অন্যদিকে তেমনি খ্রীস্টান পোপের একচ্ছত্র কর্তৃত্বও অক্ষুণ্ণ থাকে।

অভিষেকের গুরুত্ব ঃ শার্লামেনের অভিষেকের সুযোগে রোমান পোপ সুকৌশলে তাঁর স্বার্থ সিদ্ধি করেন। শার্লামেনের মত পরাক্রান্ত রাজাকে বশে রেখে রোমের চার্চের প্রতিপক্ষ গ্রীক চার্চের পোপ এবং লোম্বার্ডিদের দমন করতে চেয়েছিলেন।

রাজা হলেন রাষ্ট্রীয় প্রধান আর পোপ হলেন ধর্মীয় প্রধান। এমনি করে ধর্মশক্তির ওপর রাজশক্তির নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শার্লামেন ও চার্চের সম্পর্ক ঃ শার্লামেন ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। পোপ কর্তৃক অভিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বজায় রেখে চলতেন। এর পরে শার্লামেনের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের ওপর পোপ তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে রাজারা পোপের হাতের পুতুলে পরিণত হন। এরই পরিণতিতে ধীরে ধীরে ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়।

শার্লামেনের রাজসভা ও বিদ্যানুরাগ ঃ শার্লামেনের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তাঁর জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা জানতেন। তাঁর রাজসভা বিখ্যাত পণ্ডিতেরা অলংকৃত করতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **আলকুইন** নামে একজন ইংরেজ। আলকুইনের চেষ্টায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণী নিয়ে গড়ে ওঠে শার্লামেনের রাজসভা। অভিজাত পরিবারের সন্তানকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য রাজপ্রাসাদে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শুধু রাজপ্রাসাদেই নয়—বিশপ ও য়্যাবটদের নির্দেশ দেওয়া ছিল, প্রত্যেক গীর্জা ও মঠে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ধনী ও দরিদ্রকে লেখা-পড়া শেখাবার। সার্ফ ও স্বাধীন প্রজার সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলবে না। আলকুইনের কাছে শার্লামেন নিজেও অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতেন। শার্লামেনের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী ও জীবনী-লেখক ছিলেন। তাঁর নাম **এগিন হার্দু**। তাঁর লেখা থেকে শার্লামেনের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

শিল্প ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঃ শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি শার্লামেনের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঁর রাজধানী **আকিয়ান** নগরী সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে সজ্জিত ছিল। শার্লামেন আকিয়ানে একটি সুন্দর গীর্জা নির্মাণ করান। গীর্জার দেওয়ালে সোনা ও রূপার সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিল।

শার্লামেন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জার্মান ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে শার্লামেনের আগ্রহ ছিল। শার্লামেনের সাহিত্যানুরাগ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। শার্লামেন **ক্লিমেন্ট** নামে এক আইরিশ পণ্ডিতের কাছে অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবারের ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্য পাঠান। ছেলেরা পড়াশুনা কেমন

শিখছে তা দেখতে শার্লামেন যান। ছেলেদের প্রত্যেককে একটি করে চিঠি ও কবিতা লিখবার আদেশ দেন। যারা কবিতা লিখে দেখাতে পারেনি তাদের তিনি তিরস্কার করেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে শার্লামেনের সাহিত্যানুরাগের



ছেলেরা কেমন লেখা-পড়া শিখছে তা দেখতে এসেছেন শার্লামেন

পরিচয় দেয়। শার্লামেন তাঁর রাজসভায় কবি ও শিল্পীদের বিশেষভাবে সম্মানিত করতেন।

কৃতিত্ব : শার্লামেন ছিলেন সুশাসক, সাম্রাজ্য-বিজেতা, ধর্মপ্রাণ এবং সাহিত্য ও শিল্পরসিক। তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেই নিবৃত্ত হননি। দেশ-বিদেশের রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। বাগদাদের প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় বংশের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ শার্লামেনের রাজদরবারে একজন দূত পাঠান। সুলতানের দূত শার্লামেনকে

উপহারস্বরূপ একটি হাতী ও একটি বিচিত্র ধরনের ঘড়ি দেন। স্পেনের মুসলিম নায়ক আলকাহানের সঙ্গে শার্লামেনের সন্ধি হয়েছিল। বাইজানটাইনের রাজা আইরিণের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। এই সকল কারণে শার্লামেনকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়। শার্লামেনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্রদের আমলে ভার্দুনের সন্ধি দ্বারা ৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁর সাম্রাজ্য তিন ভাগ হলে ক্যারোলিঙ্গিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

(খ) **খ্রীস্টান মঠ : সন্নাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কথা :** মধ্যযুগ ছিল ধর্মীয় প্রাধান্যের যুগ। বর্বর জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যেরই শুধু পতন হয়নি, শিক্ষা-দীক্ষারও প্রায় অবলুপ্তি ঘটতে চলেছিল। এই অবস্থা দূর করার জন্য খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের প্রচেষ্টা উল্লেখ-যোগ্য। মধ্যযুগের সূচনাকাল থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে লেখাপড়া জানা লোক বলতে খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ও যাজকদেরই বোঝাত। চারদিকের বিশৃংখলা, অরাজকতা ও সন্ত্রাসের মধ্যে লেখাপড়ার যা সামান্য চর্চা চলত তা সম্ভব হয়েছিল খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ও যাজকদের প্রচেষ্টায়। মধ্যযুগের শিক্ষা সেজন্যই প্রধানতঃ ছিল ধর্মীয় শিক্ষা।



একজন মঙ্ক

ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকালয়ের বাইরে বহু খ্রীস্টান মঠ গড়ে উঠেছিল। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ছিল পৃথক পৃথক মঠ। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের বলা হত মঙ্ক আর মঙ্কেরা যেসব মঠে থাকতেন সেগুলিকে বলা হত **মনেস্টারিজ**। খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের বলা হত **নান** ; আর নানদের বাসস্থান ছিল **নানারিজ**। প্রত্যেক মঠে একজন করে অধ্যক্ষ থাকতেন। মঠের কাছেই ছিল বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মাঠ, পুকুর। প্রত্যেক মঠে অনেকগুলি ঘর থাকত। সেগুলির কোনটি ছিল প্রার্থনার, কোনটি ঘুমোবার আবার কোনটিতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। মঠের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা নিজেরাই সংগ্রহ করতেন।

খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় জীবন (বেনেডিক্টের ধর্মীয় নির্দেশ) : খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বেনেডিক্ট নামে এক ব্যক্তি রোমে বাস করতেন। সেখানে তিনি দেখলেন অনেক লোক বন্য এবং নিষ্ঠুরভাবে জীবন যাপন করছে। বেনেডিক্টের এসব ভাল লাগত না, তিনি এর প্রতিকারের জন্য শহর ছেড়ে নির্জন বনে গিয়ে কঠোর ধ্যানমগ্ন হন। তারপর তিনি সিদ্ধিলাভ করে জনসমক্ষে তাঁর ধর্মীয়

বিধান প্রচার করেন। নির্মল, শুদ্ধ, সংযত ও উদারমনা বেনেডিক্টের প্রভাবে তরুণেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে তিনি ইটালীতে এক



বেনেডিক্টের তৈরী মণ্টেক্যাসিনো মঠ

পাহাড়ের ওপর একটি মঠ নির্মাণ করেন। এই মঠের নাম দেন **মন্টেক্যাসিনো**। এখনও এই মঠে বহু খ্রীস্টান সন্ন্যাসী বাস করে।

বেনেডিক্ট বুঝেছিলেন জীবনকে সুন্দর, সুখময় ও মহীয়ান করে তোলার জন্য কতকগুলি নীতি ও আদর্শ মেনে চলা দরকার। সেজন্য মণ্টেক্যাসিনোতে সন্ন্যাসীদের জীবনধারা কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে তিনি কতকগুলি নির্দেশ দেন। বেনেডিক্টের সেই ধর্মীয় নির্দেশ আজও বিভিন্ন খ্রীস্টান মঠে পালন করা হয়। বেনেডিক্টের ধর্মীয় নির্দেশে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল—(১) ব্যক্তিগত সম্পত্তি সন্ন্যাসীর থাকবে না। দীন-দরিদ্রের মত হবে জীবন। (২) পবিত্র জীবন যাপন করবে। (৩) নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে যাবে। তারা সংসারী হবে না। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলবে।

য়্যাবট উপাধিধারী সন্ন্যাসী প্রত্যেক মঠের অধ্যক্ষ হবেন। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীরা যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে য়্যাবটকে নির্বাচন করবেন। সকলেই তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে। য়্যাবটরা অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মঠের শাসনকার্য চালাবেন। য়্যাবট হবেন উদার, নির্মল চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বমতসহিষ্ণু।

বেনেডিক্টের ধর্মীয় নির্দেশে মঠবাসী সন্ন্যাসীরা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বাস করতেন এবং মঠবাসী অধ্যক্ষের সব রকম আদেশ মেনে চলতেন। সাধন, ভজন, প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তাঁরা দিন কাটাতেন। এছাড়া জীবিকা

নির্বাহের জন্য সন্ন্যাসীরা দৈহিক পরিশ্রম করতেন। তাঁরা দুঃস্থ ও পীড়িতের সেবা, লেখাপড়া শেখানো এবং নানা প্রকারের জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রসারে মঠগুলির ভূমিকা : বেনেডিক্টের ধর্মীয় নির্দেশের প্রভাবে মধ্যযুগে খ্রীস্টান মঠগুলি শিক্ষাপ্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এখানে সন্ন্যাসীরা সাধন-ভজন করার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করতেন। প্রত্যেক মঠের কাছে ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরে এখানে উচ্চ শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা হয়। ধর্মতত্ত্ব, ল্যাটিন সাহিত্য, ব্যাকরণ ছিল শিক্ষণীয় বিষয়।

শিক্ষার প্রসারে খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের আর একটি অবদান হল পুরানো পুঁথির নকল করা। বই ছাপার কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না এবং কাগজের ব্যবহারও ছিল না। পড়া ও পড়ানোর মত বইয়ের অভাব তখন ছিল। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীরা ল্যাটিন ভাষায় পুঁথিগুলি পশুর চামড়ার উপরে সযত্নে লিখে রাখত। প্রথমে তা ছিল ধর্মীয় বিষয়; পরে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের পুঁথিও লেখা হয়। সেগুলি খুবই যত্নের সঙ্গে লেখা এবং সংরক্ষণ করা হত।

চার্চের দুর্নীতি মুক্ত করতে ক্লুনির সংস্কারমূলক আন্দোলন : দশম শতকে খ্রীস্টান চার্চগুলিতে স্বৈরাচার ও নীতিহীনতার প্রভাব দেখা দেয়। মঠাধ্যক্ষ কিংবা তাদের নীচুতলার খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের মর্যাদা প্রায় সমপর্যায়ে পৌঁছায়। উঁচু-পর্যায়ে খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ও যাজকরা সামন্ত শাসকদের মত দুর্নীতি ও বিলাস-বহুল জীবন যাপন করতে থাকেন। নীতি, আদর্শ, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অথবা আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিলোপ ঘটে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে কয়েকটি খ্রীস্টান মঠে বেনেডিক্টের পবিত্র ধর্মীয় নির্দেশ তখনও অনুসরণ করে চলা হত। সেগুলির মধ্যে বার্গান্ডির অন্তর্গত ক্লুনির খ্রীস্টান মঠে পুরানো বিশ্বাস এবং আচার-আচরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। এর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সারা ইউরোপে এখানকার সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হয়। এ সময়ে বহু মঠ গড়ে ওঠে। সেগুলি ক্লুনির মঠের অধীনতা মেনে চলে। এখানকার প্রচারকেরা সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে ঘুরে সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। গীর্জাগুলির সংস্কার, জার্মান নরপতি এবং ইটালীর অভিজাতদের প্রভাবমুক্ত করে তোলা এবং খ্রীস্টান ধর্মকে পৃথিবীতে বিশেষ মর্যাদা দানের আগ্রহ রূপায়িত হয়। শাসকেরা প্রায় অধীন প্রজার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। কোন স্বাধীন গীর্জা স্থাপন করে সর্বপ্রকার অধীনতা মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। সারা ইউরোপে ঐক্য স্থাপনে নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠে।

ক্লুনির সন্ন্যাসীরা যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পাপগুলি দূর করার কথা বলে তা ছিল এই—(১) সিমনি বা বিশপের পদ বিক্রয় প্রথা বন্ধ করা। (২) বিবাহিত সংসারী যাজকের পদ পাবে না। (৩) গীর্জাকে দুর্নীতি মুক্ত করা। এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

(গ) **চার্চ ও রাজশক্তির সংগ্রাম :** রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে দীর্ঘকাল অরাজক অবস্থা চলে। শার্লামেনের শাসনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা দেখা দেয়। শার্লামেনের অভিপ্রায় ছিল ধর্ম ও রাজশক্তির প্রভাবে খ্রীস্টান সমাজে ঐক্য স্থাপন করা। তাঁর চেষ্টা অনেকটা সফলতা লাভ করেছিল। এই সময় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পোপ ও সম্রাট উভয়ের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। পরে অস্ট্রিয়ার সম্রাট নব-রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট পদ গ্রহণ করেন এবং রোম ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। পোপ ও সম্রাট—উভয়েই যুগ্মভাবে ইউরোপীয় বিধি-ব্যবস্থার নিয়ামক—এই ধারণার সৃষ্টি হল। ইউরোপের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যথাক্রমে একজন ধর্মগুরু (পোপ) ও একজন রাষ্ট্রগুরুর (সম্রাটের) নেতৃত্বে পরিচালিত হত। এই আদর্শের ওপর নির্ভর করেই ইউরোপের নতুন খ্রীস্টীয় জগৎ সৃষ্টি হয়। "এক দেশ, এক রাজা, এক ধর্ম"—এই আদর্শে ইউরোপের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

শার্লামেনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারিগণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সম্রাট বলে নিজেদের দাবী করলেন। পোপ মনে করতেন—তিনিই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং সমস্ত খ্রীস্টানের উপরই তাঁর আধিপত্য। সম্রাটগণ মনে করতেন, তাঁরাও ভগবানের প্রতিনিধিরূপেই ঈশ্বরের রাজ্য শাসন করছেন। রোমের পোপ এবং সম্রাটের আধিপত্য নিয়ে বিবাদই মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

চার্চ ও রাজশক্তির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হল। পোপ দাবী করলেন শুধু ধর্মসংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা নয়, সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারেও তাঁদের সর্বপ্রকার প্রাধান্য। সম্রাট পোপের আধিপত্যের এই দাবী মেনে নিতে রাজী হলেন না।

এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় প্রথমে পবিত্র রোমান ও খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপের মধ্যে। এই বিরোধের ফল ইউরোপের সকল রাষ্ট্রেই দেখা গেল। পোপ নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সংস্কার দাবী করলেন। সম্রাট **চতুর্থ হেনরী** পোপের এই দাবীগুলি অস্বীকার করলেন। ফলে পোপ সপ্তম গ্রেগরী ও সম্রাট চতুর্থ হেনরীর মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির ওপর ধর্মীয় প্রাধান্যের প্রশ্নে সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। এই বিরোধের পরিণামে শেষ পর্যন্ত পোপই জয়লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত ১১২২ খ্রীঃ অব্দে ওয়ার্মসের চুক্তি দ্বারা পোপের সাথে জার্মান সম্রাটের এক সন্ধি হয়। এর ফলে—(১) বিশপের অভিষেকের অধিকার পোপের

হাতে চলে যায়, (২) বিশপ সরকারী কাজের জন্য রাজার নিকট দায়ী থাকেন, (৩) ধর্মীয় কাজের জন্য তাঁরা পোপের নিকট দায়ী থাকেন। অভিষেকের সন্ধির ফলে পোপের ক্ষমতা বাড়ে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইউরোপের যাবতীয় ব্যাপারে পোপেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

(ঘ) **মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** মধ্যযুগে চার্চ ও মঠগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষা ও শিক্ষিতের ভাষা ছিল ল্যাটিন। যাজকরা ও মঙ্করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু মধ্যযুগের একাদশ ও দ্বাদশ শতক থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। তখন পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। স্পেনের আরব শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংস্পর্শে এসে ইউরোপের লোকেরা নতুন করে গ্রীক সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করল। "ক্রুসেড" বা জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হল। এর ফলে ইউরোপীয় জাতির চিন্তাক্ষেত্রে এক অভাবনীয় আলোড়ন দেখা দিল। চার্চ ও মঠের শিক্ষায় সাধারণের জ্ঞানপিপাসা আর মিটল না। জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠল। মানুষের এই জ্ঞানপিপাসা মিটাবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হতে লাগল। পণ্ডিতেরা এখানে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভের জন্য এখানে আসত। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, বিজ্ঞান, রাজনীতিই ছিল প্রধান। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রই ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। শিক্ষার্থীর মধ্যে বালক ও বয়স্ক সব শ্রেণীর লোকই থাকত।

মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে ইটালীর **বোলোনা** বিশ্ববিদ্যালয় আইনশাস্ত্রে এবং **সালেনে** বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ফ্রান্সের রাজধানী **প্যারিসের** বিশ্ববিদ্যালয় ছিল খ্রীস্টানদের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র। ইংলণ্ডের **অক্সফোর্ড** এবং **কেম্ব্রিজের** বিশ্ববিদ্যালয়ও মধ্যযুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তিঃ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের **পিটার আবেলার্ড**, জার্মানীর **আলবার্ট ম্যাগনাস**, ইটালীর **টমাস একুইনাস** এবং ইংলণ্ডের **রোজার বেকন্**। ফ্রান্সের **পিটার আবেলার্ড** ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে প্যারিসে আসেন। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের মত তিনিও ছাত্রদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে চিন্তাশক্তি বাড়াবার চেষ্টা করতেন। আবেলার্ড প্রচলিত ধর্মমত মেনে চলতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন স্বীকার করতে হয়েছিল। জার্মানীর **আলবার্ট ম্যাগনাস** ছিলেন

একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানের ব্যাপারে খ্রীস্টানদের ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের কথা তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। ছাত্রদের মাধ্য তিনি তাঁর নিজের মত প্রচার করতেন। ইটালীর অধিবাসী **টমাস্ একুইনাসকে** অনেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বলে মনে করেন। বাল্যকালে তিনি খুব লাজুক ছিলেন এবং সবসময় চুপ করে থাকতেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি সাধু হয়ে মঠে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। টমাস একুইনাস ছিলেন ম্যাগনাসের একজন প্রিয় ও মেধাবী ছাত্র। মধ্যযুগ ছিল বিশ্বাসের যুগ। কিন্তু একুইনাস প্রচার করলেন যে, ধর্ম কেবল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যুক্তির উপরেও তা প্রতিষ্ঠিত। সত্য জানতে হলে যুক্তি এবং বিশ্বাস এই দুইয়েরই সাহায্য নিতে হবে।

ইংলণ্ডের মনীষী **রোজার বেকন্** ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞান লাভের আশায় তিনি অক্সফোর্ড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। রোজার বেকন্ প্রচার করলেন যে, বিজ্ঞানের কথা জানতে হলে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করে নেওয়া দরকার। বেকন্ বারুদজাতীয় বিস্ফোরক দ্রব্য, দূরবীক্ষণ যন্ত্র চশমার কাঁচ ও বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক : মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝাত সমবায় সংঘ। যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক একত্রিত হতেন সেখানেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংঘ। ছাপান বইয়ের অভাবে গ্রন্থাগারে হাতে লেখা পুঁথি সংরক্ষণ করা হত। ছাত্ররা তা পড়ত অথবা নকল করে নিত। এভাবেই শিক্ষার কাজ চলত। একাদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের কতকগুলি বাসগৃহ তৈরী হয়। এখানে শিক্ষকদের সাথে ছাত্রেরা বাস করত। এসব বাসগৃহের নাম ছিল কলেজ। পরে এখানেই গুরু বা শিক্ষকেরা শিক্ষা দিতেন। এভাবেই বর্তমান কলেজীয় শিক্ষার সূচনা। সে-যুগে ছাত্রেরা শিক্ষকদের যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিতের ছাত্ররূপে নিজেকে পরিচিত করতে অনেকেই গর্ব বোধ করত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নানা বিষয়ে অগ্রগতি : মধ্যযুগে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতি ঘটেছিল। সে যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে আইন, ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন চলত। বিজ্ঞান চর্চার দিক থেকে এসময়ে পদার্থবিদ্যা,

রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। আগেই বলা হয়েছে, ছাপানো বই তখন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানী-গুণীরাই প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়া সাহিত্য ও শিল্পচর্চার এ সময়ে অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল।

মধ্যযুগের লৌকিক সাহিত্য : মধ্যযুগে শিক্ষিত লোক ল্যাটিন ভাষায় কথা বলত এবং চার্চ, বিদ্যালয় ও বিচারালয়ে ল্যাটিন ভাষাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় ভাষা বিকাশ লাভ করেছিল এবং এই সকল ভাষায় সুন্দর সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্রান্সের **ট্রবেডুর** এবং জার্মানীর **মিনেসিঙ্গার** নামে একদল চারণ কবি সেকালে বীরদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে সুন্দর ও মনোরম গাথাকাব্য রচনা করেছিলেন। এযুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্রিটেনের রাজা **আর্থার** ও তাঁর সহচর নাইটদের কাহিনী, **রোলান্ডের** সংগীত ও ইংলণ্ডের দস্যুবীর **রবিন হুডের** বীরত্বের কাহিনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল।

মধ্যযুগের শেষভাগে আরও দুজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন—ইটালীর **দান্তে** এবং ইংলণ্ডের **জিওফ্রে চসার**। দান্তের **ডিভাইন কমেডি** এবং চসারের **ক্যান্টারবেরীর গল্প** নামক গ্রন্থে ইটালী ও ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতির সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের স্থাপত্য : মধ্যযুগে স্থাপত্যশিল্পেরও অবদান কম ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থাপত্যশিল্পে যে নূতন রীতির উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় **গথিক রীতি**। গথিক রীতির শুরু হয় ফ্রান্সে। এই গথিক রীতিতে সুন্দর সুন্দর গীর্জা তৈরী হয়েছিল। **রীমজ** নগরীর গীর্জার সামনে ও ভিতরের মূর্তিগুলি গথিক স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। লণ্ডনের ওয়েস্ট-মিনস্টার গীর্জা গথিক শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা। কলকাতার হাইকোর্ট গথিক রীতিতে তৈরী।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। এজিন হার্ড কে ছিলেন? তাঁর বিবরণী থেকে শার্লামেন সম্পর্কে কি জানা যায়?

২। রাজ্য-বিজেতা হিসাবে শার্লামেনের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝ? কিভাবে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল?

৪। শার্লামেনের শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষানুরাগ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। যাজক ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মধ্যযুগে শিক্ষার প্রসারে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

৬। চার্চ ও রাজশক্তির মধ্যে কেমন করে বিরোধের সূচনা হয়েছিল ?

৭। মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যা জান লেখ।

৮। সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। শার্লামেনের অভিষেক সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। শার্লামেনের রাজসভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। পিটার আবেলার্ড, টমাস একুইনাস, রোজার বেকন—এঁদের পরিচয় দাও।

৪। চার্চের দুর্নীতি মুক্ত করতে ক্লুনির সংস্কারমূলক আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। বোলোনা, সালেনে ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। মধ্যযুগের লৌকিক সাহিত্যের পরিচয় দাও।

৭। গথিক রীতি কি ? এ সম্পর্কে কি জান ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। বামদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের শব্দগুলির সামঞ্জস্য সাধন করে বসাও ঃ—

(ক) পোপ লিও	··· ···	(ক) শার্লামেনের সহকারী
(খ) এজিন হার্ড	··· ···	(খ) খ্রীস্টান ধর্মগুরু
(গ) আলকুইন	··· ···	(গ) বাইজানটাইনের রাজা
(ঘ) আইরিশ	··· ···	(ঘ) শার্লামেনের সভাসদ
(ঙ) বোলোনা	··· ···	(ঙ) ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক
(চ) রোজার বেকন ···	···	(চ) ইটালীর প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

২। সঠিক উত্তরটি খুঁজে চিহ্নিত করে দেখাও ঃ

(ক) মঙ্কদের নিয়ন্ত্রণ করত······	য়্যাবট/নান/য়্যাবেট
(খ) শার্লামেনের রাজধানী ছিল······	আকিন/রোম
(গ) রোলান্ড ছিলেন······	একজন ফ্র্যাঙ্ক অভিজাত/একজন লোম্বার্ড
(ঘ) শার্লামেনকে মূল্যবান ঘড়ি ও হাতি উপহার দিয়েছিলেন······	বাইজানটাইনের সম্রাট/আইরিশ/বোগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ
(ঙ) টমাস একুইনাস ছিলেন······	জার্মান বৈজ্ঞানিক/ইংরাজ বৈজ্ঞানিক

৩। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) কে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ? (খ) শার্লামেনের রাজধানীর নাম কি ছিল ? (গ) আলকুইন কে ছিলেন ? (ঘ) শার্লামেনের কোন্ বিষয় প্রিয় ছিল ? (ঙ) মঙ্ক কাদের বলা হত ? (চ) নান কি ? (ছ) ডিভাইন কমেডি কার লেখা ? (জ) চসার কে ছিলেন ?

৭ মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব : খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে শার্লামেনের মৃত্যুর কিছু পরে, পশ্চিম ইউরোপে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। সে সময় শক্তিশালী রাজ্য বা শক্তিমান রাজা ছিলেন না। তখন না ছিল শিক্ষা, না ছিল সভ্যতা। লোকের একমাত্র কাজ ছিল যুদ্ধ করা। "জোর যার মুল্লুক তার" এই ছিল তখনকার নীতি। প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত। এই সময়ে আবার নতুন করে বর্বর জাতির আক্রমণ শুরু হয়। তারা পশ্চিম ইউরোপের সম্পদশালী দেশগুলিতে হানা দিত, লুঠপাট করত, গ্রাম-নগর ধ্বংস করত। তাদের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। রাজাদের এমন শক্তি ছিল না যে, দূরের দেশের প্রজাদের রক্ষা করেন, এই অবস্থায় প্রজারা নিকটবর্তী কোন শক্তিশালী জমিদারের আশ্রয় প্রার্থনা করল। জমিদাররা তাদের আশ্রয় দিলেন, বিনিময়ে প্রজারা জমিদারের কাজ করে দেবে ও যুদ্ধ করবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন। জমিদার হলেন প্রভু, প্রজারা হল অনুচর। এভাবে মধ্যযুগে সমাজজীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল। জমিদাররা রাজার কাছ থেকে জমি নিতেন, বিনিময়ে রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতেন এবং রাজারা জমিদারকে সব বিষয়ে সাহায্য করতেন। নিজেদের জমিদারিতে সামন্তরা প্রায় স্বাধীনভাবে চলতেন। এই ব্যবস্থা **Feudalism** বা "**সামন্ততন্ত্র**" নামে পরিচিত।

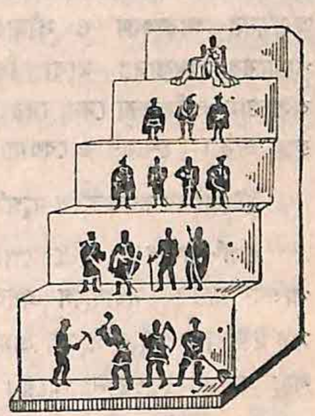
সামন্ততন্ত্র : ভূমি, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক : ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র বলতে এককথায় বোঝায় ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থা। ইংরেজিতে ফিউড কথাটির অর্থ হল জমি। জমির ওপর অধিকারই হল সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি। তখন জমির ওপর অধিকারের তারতম্য ছিল। একজন সামন্তশাসক যেমন হাজার একর জমির মালিক ছিলেন—অন্য জন তেমনি একশ একর জমির মালিক ছিলেন। সুতরাং সামন্ততন্ত্রে জমির মালিকানার ভিত্তিতে একজন সামন্তশাসকের সঙ্গে আর একজনের পার্থক্যের সূচনা হয়েছিল।

সামন্তপ্রথায় সকলের ওপরে ছিলেন রাজা—আর সকলের নীচে ছিল সার্ফ। এই প্রথায়ও ওপরতলার সামন্তশাসক তাঁর নীচু তলার সামন্তশাসককে জমি দিতেন। সেজন্য নীচু তলার শাসক উঁচু তলার সামন্তশাসকের আনুগত্য মেনে চলতেন ও তাঁকে কর দিতেন। এই সামন্তপ্রথা ছিল অনেকটা পিরামিডের মত। রাজারা ছিলেন এর চূড়া আর অর্ধ দাস বা সার্ফেরা ছিল তার প্রধান ভিত্তি। এই সার্ফেরা ছিল পরাধীন। এ ছাড়া সমাজে আরও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত অসংখ্য মানুষ ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও শাসকদের বিভিন্ন স্তর ঃ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নানা স্তরের মানুষ ছিল। সকলের ওপরে ছিলেন সামন্ত শাসকেরা, তারপর স্বাধীন মানুষ বা ফ্রী-ম্যান আর সকলের নীচে ছিল সার্ফ বা অর্ধ-দাসেরা। সামন্তেরা নিজ নিজ প্রভাবিত জমিদারিতে শাসন চালাত। স্বাধীন মানুষ বলতে তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, ব্যবসায়ী, অবস্থাপন্ন চাষী ইত্যাদি বোঝাত। এরা পেশাগত দিক থেকে স্বাধীন ছিল। যেখানে খুশি যাতায়াত করতে পারত। যা কিছু দুর্গতি ভোগ করত কেবল সার্ফরাই। এরা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীন।

সামন্তশাসকদের বিভিন্ন স্তর ঃ জমির ওপর অধিকার ও মালিকানার ভিত্তিতে সামন্তশাসকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর ছিল। সামন্ততন্ত্রে একজন সামন্তশাসকের সঙ্গে আর একজন সামন্তশাসকের পদমর্যাদা ও অধিকারের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সকলের শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজ্যের জমিজমার ওপরে ছিল রাজার একচ্ছত্র অধিকার। রাজার নীচে ছিলেন **ডিউক বা আর্ল**। রাজা ছিলেন সামন্তপ্রধান শাসক ; তাঁর নীচে ছিল ডিউকের স্থান। ডিউককে তাই বলা হত **অনুসামন্ত**। ডিউক বা আর্লেরা **ব্যারন** নামে আর একদল সামন্তশাসকের মধ্যে জমি বণ্টন করতেন। ব্যারনদের নীচে ছিল **নাইটের স্থান**। ছোট ছোট অঞ্চলে নাইটেরা শাসন কর্তৃত্ব চালাতেন।

সকলের ওপরে রাজা, রাজার নীচে আর্ল বা ডিউক, তার নীচে ব্যারন এবং সকলের নীচে ছিল নাইট—এই নিয়ে ছিল সামন্তশাসকদের স্তরবিভাগ। উঁচু তলার সামন্তশাসক তাঁর চেয়ে নীচু তলার সামন্তশাসকদের কাছ থেকে জমিদারির ওপর অধিকার লাভ করতেন। তাই নীচু তলার সামন্তশাসক তাঁর চেয়ে উঁচু তলার সামন্তশাসকের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে চলতেন। বিপদ-আপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়, নীচু তলার সামন্তশাসক তাঁর চেয়ে উঁচুতে যিনি আছেন তাঁর কাছে কর পাঠাতেন, সৈন্যের যোগান দিতেন। অন্য সময়ে প্রত্যেক সামন্তশাসক নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতেন। (তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে খুশিমত কর আদায় করতেন। নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুসারে প্রজাদের (সার্ফদের) খাটাতে কোন দয়া-মায়া দেখাতেন না।)



সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্তর বিভাগ

সামন্তপ্রথায় সমাজে সকলের নীচে ছিল পরাধীন অর্ধ-দাস বা সার্ফেরা। সামন্তরা ভরণ-পোষণের বিনিময়ে তাদের দিয়ে সকল রকম কাজ করাত। এমনিভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সাধারণ মানুষের ওপর ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব স্থাপন ঃ আমরা আগেই জেনেছি, সামন্তশাসকদের মধ্যে অর্থ ও বিত্তের ভিত্তিতে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ছিল। সামন্তশাসকেরা নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলে ছিলেন সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁদের হাতে শাসন-ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। জমির ওপর অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধন তখন বজায় ছিল। রাজা রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ; রাজ্য রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। রাজা সামন্তপ্রথার নিয়ম অনুসারে অভিজাতদের নিকটে কতকগুলি শর্ত আরোপ করতেন।

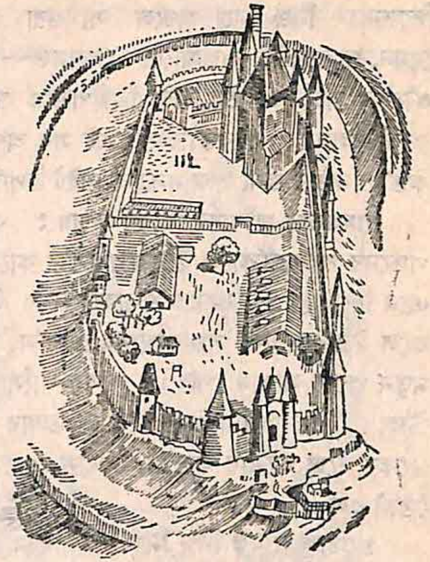
সামন্ততন্ত্রে উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে নিম্ন পর্যায়ের বন্ধন ছিল। একজন সামন্তশাসক যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় নিম্ন পর্যায়ের সামন্তশাসকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। সামন্তশাসকদের লোভ ছিল সীমাহীন ; ক্ষমতার মোহ ছিল প্রবল। তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে চাইতেন। সেজন্য তাঁরা জনসাধারণের ওপর নির্যাতন চালাতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। নীচু স্তরের সামন্তশাসক ও উপরের স্তরের শাসকদের মধ্যে সব সময়েই রেষারেষি লেগে থাকত। এমনিভাবে সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও সীমাহীন লোভের ফলে উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে নিম্ন পর্যায়ের সামন্তদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। শাসক-শাসিতের মধ্যে অসন্তোষ ও তিক্ততা দেখা দেয়। এর ফলে অসহায় সার্ফদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। শোষণ ও বৈষম্য ক্রমশঃ প্রবল হয়।

ইউরোপের রক্ষকরূপে দুর্গ-প্রাসাদ বা অশ্বারোহী সৈনিকদের ভূমিকা ঃ

দুর্গ-প্রাসাদ ঃ ইউরোপের অনেক জায়গায় এখনও প্রাচীন দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এসব দুর্গে সামন্তেরা বাস করতেন। অন্যদেশের মত ইউরোপের দুর্গগুলো এমন জায়গায় তৈরী করা হত যাতে হঠাৎ কোন শত্রু আক্রমণ করতে না পারে। উঁচু জায়গা থেকে যাতে অনেক দূর দেখতে পাওয়া যায় এবং শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়—সেজন্য অনেক সময় পাহাড়ের ওপর দুর্গগুলি তৈরী করা হত।

ক্যাসেল নামে পাথর দিয়ে এগুলি তৈরী হয়। এসব দুর্গগুলিকে তাই বলা হত **ক্যাসেল হাউস বা দুর্গ-প্রাসাদ**। বিপন্ন ইউরোপবাসীকে সন্ত্রাস ও অরাজকতা থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ক্যাসেল হাউসের বাসিন্দা সামন্তদের ভূমিকা

ছিল অসাধারণ। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে যখন সন্ত্রাস ও অরাজকতা চলছিল —সে সময়ে বিপন্ন ইউরোপবাসীর রক্ষকরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সামন্তশাসকেরা। সামন্তদের সাহস ও বীরত্বের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করত। সেজন্য দুর্গ-প্রাসাদের চারদিকে তারা বসতি গড়ে তুলেছিল।



দুর্গ-প্রাসাদ

কোন আক্রমণকারী হঠাৎ আক্রমণ চালালে জনসাধারণ দুর্গ-প্রাসাদে আশ্রয় নিত। দুর্গ-প্রাসাদের মালিক সামন্তশাসক নিজের অধিকার ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য আক্রমণ প্রতিরোধ করতেন। জনসাধারণ সামন্তদের সাহস ও বীরত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হত। তারাও প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামন্তদের নেতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করত। মধ্যযুগে একাদশ শতকে এমনিভাবেই এক-একটি ক্যাসেল হাউস ইউরোপের সহায়-সম্বলহীন দুর্বল মানুষের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল।



একজন নাইট

অশ্বারোহী সৈনিক : মধ্যযুগে বীর পুরুষেরা সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পেতেন। তখন ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। এই সব বীর-পুরুষ ছিলেন পেশাদারী যোদ্ধা, সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং অসাধারণ রণকুশলী। তাই ছোট-ছোট অঞ্চলে এই সব অশ্বারোহী বীরযোদ্ধার খুবই প্রভাব ছিল। সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা করত। দুর্বল সবলের কাছে অত্যাচারিত হলে অশ্বারোহী বীরপুরুষেরা তাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে

যেতেন। লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের পাশে গিয়ে তাকে সাহস ও ভরসা দিতেন। নিজ নিজ অঞ্চলে সামন্তরা নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন, খালকাটা, রাস্তাঘাটের মেরামত—আরও কত কি করতেন। এ ছাড়া খ্রীস্টান চার্চ ও মঠগুলির নিরাপত্তার জন্য তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সব অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা সাহস, বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সম্মানসূচক **নাইট** উপাধিতে ভূষিত হন।

সামন্ততন্ত্র জীবনের বিশেষ উপায় : বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোম নগরীর পতনের পরবর্তীকালে ইউরোপবাসীর কাছে আতঙ্ক, নৈরাশ্য ও হতাশার ভাব এনে দিয়েছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এই অবস্থা চলে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ইউরোপবাসী সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন করে দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের নতুন পথের সন্ধান পেল। শাসক-শাসিতের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠল। উঁচু তলার শাসক নীচু তলার শাসককে মেনে চলতে শুরু করল। একের সঙ্গে অন্যের কর্তব্য, বিশ্বাস এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তৈরী হল।

প্রত্যেক সামন্ত নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলে সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁর আদেশ প্রজারা মেনে চলত। সামন্তেরাও প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিতেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সামন্ত বাইবেল ছুঁয়ে তাঁর ওপরের সামন্তের প্রতি অনুগত হয়ে থাকার শপথ নিতেন। জনসাধারণ সেজন্য সামন্তদের অধিকারকে পবিত্র কর্তব্য ও ধর্মের নির্দেশ বলে ভাবত। সামন্তরাও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য করতে শৈথিল্য দেখাতেন না। শাসক-শাসিতের মধ্যে এরূপ বোঝাপড়া সামন্ততন্ত্রের প্রচলনের পরবর্তীকালে বিপর্যস্ত ইউরোপের ভগ্ন মনোবলকে নতুনভাবে ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল।

শিভালরি : আমরা আগেই জেনেছি, সামন্তশাসকদের মধ্যে সকলের নীচে ছিলেন নাইটেরা। নাইট হল বীরযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদাসূচক উপাধি। এঁরা ছিলেন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁদের ধর্ম ছিল বীরের ধর্ম, আচার-আচরণ বীরের মত। এরূপ আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ রূপায়িত হয়েছিল তাকে বলা হত **শিভালরি**। বিপন্ন ইউরোপবাসীর কাছে বিশৃংখল ও অরাজক অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসেবে দেখা দিয়েছিল বীরের মানসিকতা।

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরা সাত বছর বয়স থেকে কোন কোন অভিজ্ঞ সামন্তের অধীনে যুদ্ধ শিক্ষা করত। ষোল বছরের পর তারা শিখত তরবারি ও বর্শাচালনা। শিক্ষানবীশী সময়কে বলা হত **স্কোয়ার**। একুশ বছরের পরে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোন উচ্চ সামন্ত স্কোয়ারের

মাথায় তরবারি ছুঁইয়ে তাকে নাইট উপাধি দিতেন। শপথ গ্রহণের পরে নাইট তার প্রভুর কাছে নতজানু হয়ে ধর্মরক্ষা, নারীর মর্যাদা রক্ষা, আর্তের সাহায্য ও সহচর নাইটদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করত। উচ্চ সামন্ত তখন নতুন নাইটকে সাহসী ও বিশ্বস্ত হবার উপদেশ দিয়ে দীক্ষানুষ্ঠান শেষ করতেন।



অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেকে নাইট উপাধি দিচ্ছেন

নাইট কতকগুলি আদর্শ ও নীতি মেনে চলত। তাদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশ পেত। যেমন, (১) প্রভুর প্রতি অনুগত থাকা, (২) ধর্মের রক্ষক হওয়া, (৩) দুর্বল ও বিপন্নকে রক্ষা করা, (৪) সাহস নিয়ে চলা ও বীরত্ব।—এ সবই হল শিভালরি। মৃত্যুভয়হীন দুঃসাহসী নাইট অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। তাদের বল ও ভরসা দিতেন। নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করতেন না। কখনও কখনও তাঁরা বর্ম পরে তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নকল যুদ্ধের মহড়া দিতেন। এইরূপ যুদ্ধকে বলা হত টুর্নামেন্ট।

নাইটদের জীবন ছিল নীতি ও আদর্শমণ্ডিত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ছিল তাঁদের প্রধান ধর্ম। এই আদর্শই হল শিভালরির মহৎ প্রকাশ। এভাবেই নাইটরা দুর্বল জনসাধারণের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এবেদুয়ার ঃ বীরের কাহিনী, বীরের ধর্ম, বীরের আদর্শ—এ সব কিছুই ছিল মধ্যযুগের মানুষের প্রিয়। মধ্যযুগে ফ্রান্সে এবেদুয়ার নামে একদল চারণ কবি গান গেয়ে বেড়াতেন। তাঁদের গানের বিষয়বস্তু ছিল অতীতের মহান

বীরদের শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমের কাহিনী। এবেদুয়ারদের চারণগীতি শুনে নাইটেরা উৎসাহ পেতেন, সামন্তেরা আনন্দ পেতেন এবং জনসাধারণ ভয়শূন্য



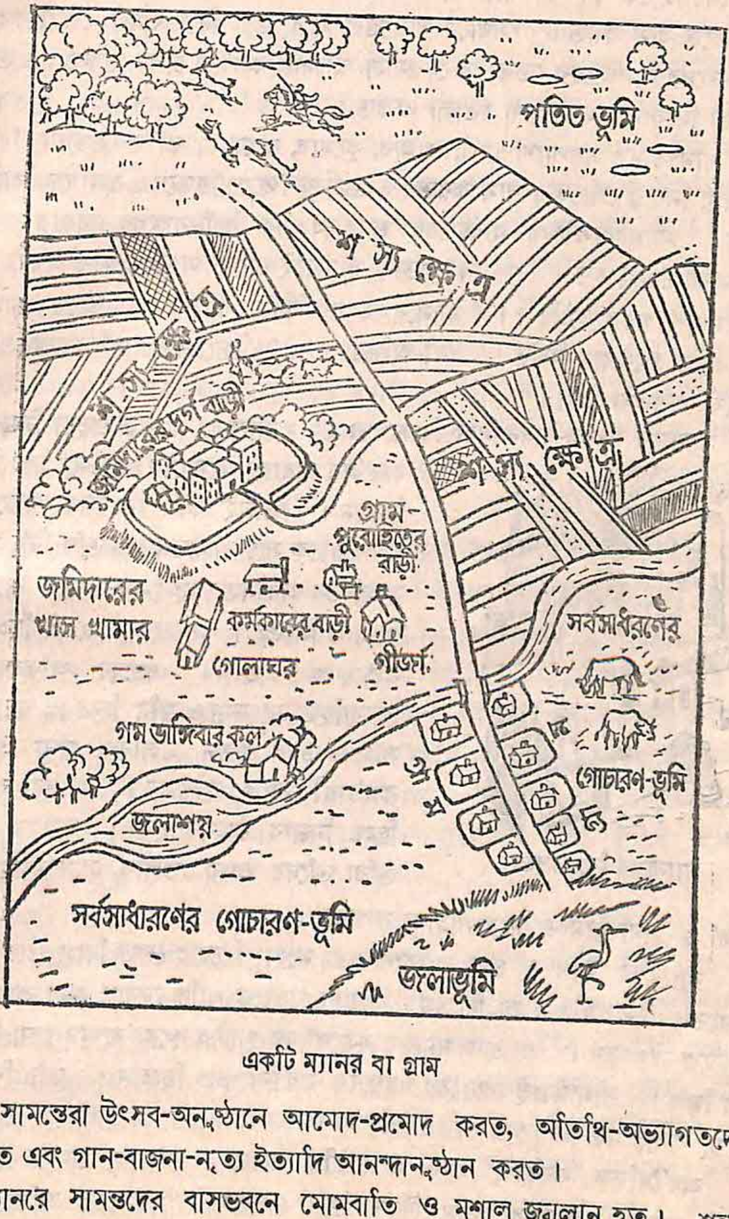
এবেদুয়ার নামে একদল চারণ কবি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন

হত। এবেদুয়ারদের চারণগীতি মধ্যযুগে ইউরোপবাসীর কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

(খ) **ম্যানর প্রথা** : সামন্ততন্ত্রে কৃষিই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। তখন অধিকাংশ লোকই ছিল গ্রামীণ। ছোট-বড় অনেকগুলি গ্রাম, এগুলিকে বলা হত ম্যানর। প্রত্যেক ম্যানরের কোন প্রভু বা জমিদার ছিল। গ্রামের জমির খানিকটা ছিল তাঁর খাস দখলে ; বাকীটা ছিল প্রজাদের দখলে। অগুনতি টুকরো টুকরো জমি—সেখানে চাষ করত অসংখ্য ছোট চাষী। উৎপন্ন ফসলের একটা বিরাট অংশ ছিল জমিদারদের পাওনা, চাষীরা খাটত কখনও নিজের জমিতে। কখনও জমিদারের এলাকার মধ্যে। তখন চাষের ধরন ছিল অনুন্নত। একজনের সঙ্গে অন্যের জমির সীমানা ছিল অস্পষ্ট। ম্যানরের জমিদার তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতেন। সেটা থেকে তিনি তাঁর ওপরের সামন্তকে কর-স্বরূপ কিছু পাঠাতেন। নীচু তলার সামন্ত তাঁর ওপরের সামন্তকে আনুগত্য স্বরূপ অর্থ ও সম্পদ প্রেরণ করতেন। সেটা হাত ঘুরে রাজার কাছে গিয়ে পৌঁছোত। এমনিভাবে ম্যানর প্রথার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল সামন্ত-তন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ।

ম্যানর : আমরা আগেই জেনেছি, সামন্ততন্ত্রের প্রধান ভিত্তি ছিল গ্রাম এবং গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থা। গ্রামগুলি ছিল সামন্তদের অধীন। এখানেই ছিল কৃষি-যোগ্য জমি। এই গ্রামগুলিকেই বলা হত ম্যানর। সামন্তেরা ছিলেন ম্যানরের মালিক—জমিদার। ম্যানরের মধ্যেও তাঁরা দুর্গ নির্মাণ করে বাস করতেন। মধ্যযুগ হল অরাজকতা ও যুদ্ধবিগ্রহের যুগ। সেজন্য সামন্তদের বাসভবনগুলি ছিল সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। ম্যানরে সামন্তের বাসভবনটি ছিল উঁচু ও চওড়া

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এতে অনেকগুলি ঘর থাকত। ঘরগুলি আকারে ছোট। আলো-বাতাস বিশেষ প্রবেশ করতে পারত না। সবচেয়ে বড় ছিল ভোজন-গৃহ।



একটি ম্যানর বা গ্রাম

তাতে সামন্তেরা উৎসব-অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদ করত, অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়াত এবং গান-বাজনা-নৃত্য ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠান করত।

ম্যানরে সামন্তদের বাসভবনে মোমবাতি ও মশাল জ্বালান হত। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ক্যাসেল ঘিরে প্রাচীর, বুরুজ ও পরিখা থাকত।

ক্যাসেল থেকে বাইরে যাতায়াতের জন্য এক বিশেষ ধরনের সেতুর ব্যবস্থা ছিল। সেগুলি প্রয়োজনে ওঠানো-নামানো যেত।

দেশের যে সব জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত না সে সব অঞ্চলের লোকজন শান্তিতে বাস করত। সেখানে সামন্তেরা পুরু তক্তা দিয়ে বাড়ী তৈরী করত। সামন্তদের বাসগৃহের ভেতরের দেওয়াল বুটিদার কাপড়ে ঢাকা থাকত। তাতে সুতো দিয়ে নানান নকশা তোলা থাকত।

সামন্তদের চারপাশে চাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা বাস করত। এছাড়া পুরোহিতদের জন্য ছোটখাট মঠ ছিল। ম্যানরবাসীদের ব্যবহারের জন্য যে সব জিনিসপত্রের দরকার হত তা ম্যানরেই তৈরী হত। এভাবে প্রত্যেক ম্যানরেই একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা গড়ে উঠেছিল। ম্যানরে যে সব জিনিস তৈরী হত তাতে ম্যানরের লোকদের প্রয়োজন মিটত। ধনী-অভিজাত ও দরিদ্রশ্রেণীর জীবনধারার মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল।

ম্যানরের স্বায়ত্ত-শাসন এবং বিচারসভা ঃ ম্যানরের সামন্ত প্রভুরা নিজ নিজ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তিনিই কর নির্ধারণ করতেন। অপরাধীকে সাজা দিতেন। তাঁর উঁচু স্তরের সামন্তের অধীনতা মানা-না-মানার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। ম্যানরের মধ্যেই ছিল চাষ করার মত জমি। এছাড়া অভিজাত ও পুরোহিতদের জন্যও জমি ছিল। ম্যানরের সামন্ত তাঁর শাসন চালাবার জন্য একদল কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। তাঁদের অধীনে ছিল নিজস্ব সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধের সময় তাঁরা তাঁদের ওপর তলার সামন্তকে অস্ত্র, অর্থ ও সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সাহায্য করতেন।



ম্যানরের বিচারসভা

ম্যানরের সামন্ত প্রভু বাসিন্দাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তার বিচার করতেন। দোষীকে সাজা দিতেন। অবাধ্য চাষীকে শাস্তি দেবার জন্য কারাগারে আটকে রাখতেন। প্রত্যেক ম্যানরে কয়েদীদের আটক করে রাখার জন্য বিশেষ ঘর ছিল। সামন্তপ্রভু বিচারের ব্যাপারে সর্বনিয়ন্তা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার মত অধিকার কারও ছিল না।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ চাষ ও চাষীর অবস্থা ঃ সামন্ত প্রথায় ছোট-বড় সকল সামন্তের আয়ের প্রধান উৎস ছিল চাষবাস। ম্যানরের অধিবাসীদের

অধিকাংশই ছিল কৃষক। ম্যানরের মধ্যেই ছিল চাষ করার মত জমি। সেখানে চাষীরা চাষ করত।

সমাজে ক্রীতদাস প্রথা বজায় থাকলেও, তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। চাষীদের মধ্যে একদল ছিল স্বাধীন চাষী বা ভিলেন। তাদের সামান্য জমি থাকত। অন্য সময়ে তারা জমিদারের খাস খামারে কাজ করে দিত। চাষীদের মধ্যে আর একদল ছিল পরাধীন। তারা জমিদারের জমি কিংবা খ্রীস্টান চার্চের জমিতে চাষ করত। এদের জীবন ছিল ক্রীতদাসের মত। তবে হাটে-বাজারে পশুর মত এদের কেনা-বেচা চলত না। তারা জমির সঙ্গেই বাস করত। তাই কোন জমি বিক্রী হলে ঐ জমির সঙ্গে সার্ফরাও ক্রেতার অধীনে চলে যেত।

ম্যানরের মধ্যে কাঠ ও খড় দিয়ে কুটির তৈরী করে দরিদ্র চাষী বাস করত। ঘরের জানালা ছিল ছোট ছোট। তাতে যথেষ্ট আলো-বাতাস ঢুকত না। সম্পন্ন চাষীরা পাথরের তৈরী বাড়িতে থাকত। প্রত্যেক চাষীর ম্যানরে শুয়র, বলদ ও দু-একটি গরু থাকত। অবস্থা ভাল হলে কেউ কেউ ঘোড়াও রাখত। চাষী ও সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল গমের রুটি, শাক-সবজি আর পচা মদ।

চাষীদের কঠোর পরিশ্রম : চাষীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করত। তারা ছিল মনিবের খেয়াল-খুশির অধীন। কাজে সামান্য ত্রুটি হলে তারা নিস্তার পেত না। সামন্ত শাসকের কাজ শেষ হতে না হতেই গীর্জায় ডাক পড়ত। সেখানেও তারা বিনা মজুরিতে কাজ করত। এর পর ধনী-অভিজাতরা কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামত খাটিয়ে নিত। স্বাধীন কৃষকদের সামান্য জমি থাকলেও ভূমিদাস বা সার্ফদের কিছুই ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীন, নিঃস্ব ও সর্বহারা ; তাই দিন-রাত্রি পরিশ্রম করেও তারা ভাল করে খেতে পেত না। সামান্যতম ত্রুটি হলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হত।

করের বোঝা : প্রত্যেক ম্যানরে ছিল পৃথক শাসন-ব্যবস্থা ও রীতি। একটি ব্যাপারে কিন্তু ম্যানরগুলির মধ্যে অদ্ভুত মিল ছিল ; তা হল ম্যানরের সামন্ত এবং তাঁদের অনুগতদের আয়ের প্রধান উৎস। কৃষি থেকে উপার্জিত অর্থ, বিত্ত ও সম্পদ হল সে আয়ের উৎস। তাই ম্যানরের সামন্তেরা তাদের আয় বাড়াবার জন্য কৃষকদের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দিতেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ—কিছুতেই চাষী রেহাই পেত না। চাষীদের দুরবস্থার সুযোগে সামন্তদের সঙ্গে তাঁদের অনুগত ধর্মযাজক এবং অভিজাতরাও সুযোগ নেবার চেষ্টা করত। ধর্মযাজক চাষীকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে বেগার খাটাত। অভিজাত ধনীরাও একই কৌশল

নিত। প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য ছিল—সেটা হল চাষীকে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে বেশি কর আদায় করে ম্যানরের সব খরচ চালান।

সামন্তপ্রভু ও চার্চের জন্য কৃষকের বেগার খাটুনি : চাষীদের কাছ থেকে সামন্তপ্রভু এবং চার্চের অনেক পাওনা ছিল। সেটা চাষীকে নগদে অথবা অন্য কোন উপায়ে পরিশোধ করতে হত। সেজন্য সামন্ত প্রভুর খুশিমত চাষীকে কর দিতে হত। চার্চের অধীনে জমিতে চাষ করলেও চাষীকে কর দিতে হত। চাষবাসের ফলে মাঠে যে ফসল পাওয়া যেত তার ওপরেই কর ঠিক করা হত। সাধারণতঃ চার্চের উৎপন্ন শস্যের অধিকাংশই চার্চের গোলায় উঠত। সামন্ত প্রভুরা চাষীকে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ দিতেন। আর বেশীর ভাগই তাঁরা তাঁদের গোলায় তুলে নিতেন।

মধ্যযুগে চাষীর হঠাৎ কোথাও চলে যাওয়া কঠিন ছিল। জমিদারের জমি চাষ, ফসল তোলা, গরু-ভেড়ার যত্ন করা, ঘরের কাজ, রাস্তাঘাট মেরামত করা—এতগুলি কাজ করার পরে নিজেদের জমির দিকে তাকাবার মত সুযোগ তাদের জুটত না। তার ওপর তাকে প্রভুর গম ভাঙতে হত। তার নিজের রুটিও প্রভুর উনোনে তৈরী করে নিতে হত এবং এর জন্য প্রভু তার কাছ থেকে খুশিমত ভাড়া আদায় করে নিতেন। জমিদারের বাড়ীতে কিংবা জমিতে ইচ্ছামত খাটিয়ে পাওনা চুকিয়ে নেওয়া হত। অসহায় চাষী বিনা প্রতিবাদে তার প্রভুর জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেও পুরো পাওনা চুকিয়ে দিতে পারত না।

দুর্গ-প্রাসাদে সামন্তদের জীবন : দুর্গ-প্রাসাদের মধ্যে থাকতেন ম্যানরের মালিক বা জমিদার। এসব দুর্গ-প্রাসাদগুলি ছিল পরিখাবেষ্টিত ও সুরক্ষিত। দুর্গ-প্রাসাদের মধ্যে ছিল জমিদারের অতিথি আপ্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষ। এছাড়া ছিল কোষাগার, রসুইখানা, শয়নাগার ইত্যাদি।

দুর্গ-প্রাসাদে জমিদারের দিন কাটত আরাম ও বিলাসে। তাঁদের একদল অনুগত তোষামোদকারী ছিল। জমিদারবাবু তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে শিকারে বার হতেন। অবসর সময়ে আনন্দ দেবার জন্য চারণ কবি, ভাঁড় এবং বাজিকর থাকতো। এছাড়া তাস ও দাবা খেলে অবসর কাটাতেন। মাঝে মাঝে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হত। সেখানে শুয়র বা গরু সেদ্ধ করে রাখা হত। অতিথিরা ইচ্ছেমত টুকরো টুকরো করে কেটে খেত। সেজন্য জমিদাররা অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতেও কসুর করতেন না।

ম্যানরবাসী প্রধান তিনটি শ্রেণী : প্রত্যেক ম্যানরে যে সব লোক বাস করত তারা প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত, ধর্মযাজক ও সাধারণ মানুষ। অভিজাতরা ছিলেন এক একজন ছোট-খাট সামন্তপ্রভু। তাঁদের বেশভূষার কোন বাহুল্য ছিল না। পশুর চামড়া ও পশমের কাপড় ছিল সাধারণ

পরিচ্ছদ। সাধারণতঃ এঁরা চাষবাস করতেন না। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা ম্যানরের শাসনবিধি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন ; এঁদের অধীনে ছিল একদল চাষী। তারা তাদের জমিতে লাঙল দিত, বীজ বুনত এবং ফসল উঠলে গোলায় তুলে দিয়ে আসত।

প্রত্যেক ম্যানরে ধর্মকর্ম পরিচালনার জন্য ছোট-খাট মঠ থাকত। সেখানে একজন খ্রীস্টান-যাজক ধর্মকর্ম পরিচালনা করতেন। আর এই যাজকের মুখে শুনে ম্যানরবাসীরা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন। রবিবার সকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে ঈশ্বরের উপাসনা সভায় যোগ দেওয়া উচিত। যাজকেরা আরও বোঝাতেন যে, রোমের পোপ হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁরই কাছে আছে স্বর্গ ও নরকের চাবি। পোপের কথা অমান্য করা মহাপাপ। পোপের নামে যাজকরা প্রত্যেক ম্যানরবাসীর আয়ের দশভাগের একভাগ আদায় করতেন। প্রত্যেক যাজক খ্রীস্টান মঠ বা গীর্জার নাম করে কিছু কিছু চাষ-যোগ্য জমি রাখতেন। ধর্মের ভয় দেখিয়ে চাষীদের সে জমিতে বেগার খাটান হত। যাজকেরা ধর্মীয় বিধান দিতেন। শত অপরাধ করলেও তাঁদের কোন শাস্তি দেওয়া হত না। জমিদারকে তাঁরা কোন কর দিতেন না। ধর্মকর্ম ছাড়া যাজকেরা অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষার দিকেও সামান্য নজর দিতেন।

ম্যানরের বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দশাময় জীবন ছিল সাধারণ মানুষের। এদের মধ্যে ছিল সাধারণ কারিগর ও ভূমিহীন চাষী। সাধারণতঃ ভূমিহীন চাষীরা ম্যানরের অভিজাত কিংবা যাজকদের জমিজমা চাষবাস করত। জমিদার বা কোন সামন্তকে তাদের কর দিতে হত। কখনও তাদের জোর করে বেগার খাটান হত। এদের জন্য যে আদালত ছিল সেখানে লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান দেওয়া হত।

বৈষম্যময় জীবনধারা ঃ (ম্যানরে বসবাসকারী অভিজাত ও যাজকদের জীবন-ধারা ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। খাওয়া-পরা—কোন দিক থেকে তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। সামন্তশাসকেরা এদের হাতের মুঠোয় থাকতেন। সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবন ছিল চরম দুঃখ-দুর্দশায় ভরা। বিশেষ করে ভূমিহীন চাষী বা সার্ফদের অবস্থা ছিল বিশেষ শোচনীয়। তারা অন্যের জমিতে বেগার খেটেই কাটাত। সামন্তদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই এদের ভাগ্য নির্ধারিত হত। সামান্য অপরাধে সাধারণ মানুষ কারাবাস, দৈহিক নির্যাতন প্রভৃতি ভোগ করত।) 4

প্রত্যেক ম্যানরের সামন্ত নিজের জন্য কিছু জমি রেখে বাকি অংশ প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। প্রত্যেকেই কতকটা ভাল, কতকটা মন্দ জমি পেত। একজনের জমির সঙ্গে অন্যের জমি ভাগ করা থাকত। সব জমি এক সঙ্গে একই

রীতিতে চাষবাস করা হত। প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য ছিল—গম, বার্লি ও রাই। এসব ফসল উৎপাদন করত যে চাষী তার জীবন ছিল অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে ভরা। থাকবার জন্য কোনরকম একটু বাসস্থান ও সামান্য খাদ্য পেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকত। সামন্ত প্রভু ও অভিজাত ছাড়া যাজকদের জমি-জমাও তারা বিনা মজুরিতে চাষ করে দিত। ধর্মের নামে যাজকেরা নির্মম শোষণ চালাতেন।

সার্ফদের দুঃখময় জীবন ঃ আমরা আগেই জেনেছি জমি-জমা চাষবাসের ওপর ভিত্তি করেই সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। চাষ করত যে চাষী তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব ও অসহায় ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। এই সার্ফরা ঠিক দাস নয়। আইনতঃ তারা তাদের প্রভুর সম্পত্তি ছিল না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সার্ফদের হাতে অল্প-স্বল্প জমি থাকত। তাদের সংসার চলত না। সার্ফেরা ছিল তাদের প্রভুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন। তারা প্রভুর জমিতে বেগার খাটার জন্য হাজিরা দিত। নিজেদের জমির ফসল থেকে প্রভুর পাওনা মিটাত। জমি বিক্রী হলে সার্ফও নতুন মালিকের অধীন হত। এই সার্ফেরা ছিল শোষিত শ্রেণীর। সেই শোষণের প্রধান কথা হল নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন বেগার খাটিয়ে জমিদারদের জমি চাষ করিয়ে নেওয়া।

শাসন ব্যাপারে প্রজাদের সঙ্গে রাজার সরাসরি সম্পর্ক ছিল না—সেটা ছিল জমিদারের সঙ্গে। তারাই ছিল আসল শাসক। অসহায় সার্ফ জমিদারকে খাজনা দিত। জমিদারের খাসতালুকে মুখ বুজে নির্বিবাদে খেটে দিয়ে আসতো। আবার চার্চের জন্যও সার্ফকে এমনি করে বেগার খেটে দিয়ে আসতে হত। জমিদারের নির্দেশে খাল-খনন, সাঁকো তৈরী ইত্যাদি কাজও সে বিনা মজুরিতে করে দিয়ে আসত। ফসল উঠলে সার্ফ গিয়ে সেটা জমিদারের গোলাঘরে তুলে দিত। জমিদারের বাড়ীতে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হলে সার্ফরা সেখানে হাজিরা দিয়ে সারাক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়ে গীর্জার পুরোহিতের নির্দেশ মত মুখ বুজে খেটে দিত। অভাবের তাড়নায় সার্ফরা জমিদারের কাছ থেকে ঋণ নিত। জমিদার সার্ফকে দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে সেটার শোধ তুলে নিতেন। যেমন, সার্ফ জমিদারের ভাটিখানায় গিয়ে আঙুর থেকে মদ তৈরী করে দিয়ে আসত। বাড়ি-ঘর মেরামতির সময়ে জন-মজুরের কাজ করত। এক কথায় বিনা প্রতিবাদে জমিদারের আদেশ মত সার্ফ অগুনতি কাজ করে দিত। সেজন্য সে কোন পারিশ্রমিক দাবী করতে পারত না। কারণ অন্যায় ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার সার্ফদের ছিল না।

বংশানুক্রমিক দাসত্ব ঃ সার্ফ বা ভূমিহীন চাষীদের বংশ-পরম্পরায় সামন্ত প্রভুর দাসত্ব করতে হত। তারা না পেত শিক্ষা কিংবা বাঁচার মত কোন সুযোগ-

সুবিধা। জমির মালিকানা বদল হলে সার্ফও অন্য মালিকের অধীন হত। নতুন মালিকও সার্ফকে দিয়ে যথেষ্ট খাটিয়ে নিত।

মুক্তির চেষ্টা : নির্মম শোষণ আর উৎপীড়নের হাত থেকে সার্ফেরা মুক্তি পাবার জন্য ক্রমশঃ উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সামন্ত প্রভুদের নজর থেকে কেমন করে আত্মরক্ষা করা যায় তারা সেকথা ভাবতে শুরু করে। ছোট-খাট শহরের সৃষ্টি হবার ফলে সেখানে ধীরে ধীরে শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। সার্ফেরা দেখল গ্রাম ছেড়ে একবার শহরে যেতে পারলে তাদের রোজগারের অভাব হবে না। ক্রমে সার্ফেরা গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পা বাড়াতে শুরু করে। নতুন জীবনের আকর্ষণে মাঠে ফসল ফলাবার আশা ছেড়ে দিয়ে তারা কারখানার মজুরের খাতায় নাম লেখায়। এতদিনে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাদ পায়। ঐশ্বর্য ও সম্পদ বাড়িয়ে তুলে সমাজে ধনীর সৃষ্টি হয়। ধনীদের লোকবল অপরিহার্য হলে একদল দাসের উদ্ভব হয়। আর চাষের জমিতে যেদিন ভূমিহীন চাষী কাজ নিল সেদিন দাসতন্ত্রের অবসানে সূচনা হল সামন্ততন্ত্রের। এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে একদল সর্বহারা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরে চলে যায়। এবার সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে কালের নিয়মে নতুন স্থান করে নিল পুঁজিবাদ। আর এই পুঁজিবাদী শোষকের নতুন বৈশিষ্ট্য হল মালিক শ্রেণী। আর শোষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর।

সামন্ত প্রথার সুফল : বর্বর জাতির আক্রমণের সময় ইউরোপের নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কাজে সামন্ত প্রথা খুবই কাজে লাগে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে বিশৃংখলা দেখা দিলে সামন্ত প্রভুরা আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নেয়। দ্বিতীয়তঃ, সামন্তদের দুর্গগুলিতে চারণ কবি, বিদ্বান, শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তৃতীয়তঃ, সামন্ত দুর্গগুলিতে শিভালরি ও নাইট প্রথার জন্ম হয়। চতুর্থতঃ, সামন্ত প্রভুরা রাজার স্বৈরাচারী হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

সামন্ত প্রথার কুফল : সামন্ত প্রথার নির্মম শোষণ, ধনী-দরিদ্রের নিদারুণ বৈষম্য, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ইত্যাদি কারণে কুফল দেখা দেয় ও বিদ্রোহের পট-ভূমিকা প্রস্তুত হয়। ধর্মের নামে ইউরোপে যে ক্রুসেড হয়েছিল তাতে অনেক সামন্ত যোগ দিয়ে একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, সামন্ত প্রভুরা সমগ্র দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজ স্বার্থ বড় করে দেখত। দেশের রাজা প্রজাদের মঙ্গলের দিকে নজর দেওয়ার সময় পেতেন না। তৃতীয়তঃ, সামন্ত প্রভুরা উগ্র স্বভাবের, যুদ্ধবাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অভ্যস্ত ছিল। ফলে দেশে শান্তি বিনষ্ট হত। চতুর্থতঃ, সামন্তদের অধীনে ভূমিদাসদের জীবন ছিল বিষণ্ন, নিরানন্দময় ও বংশানুক্রমিক দাসত্বে আবদ্ধ।

ইতিমধ্যে জনগণের অসন্তোষ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে। এক সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন, স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিনাশ ও সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা রূপায়িত হয়। এই অবস্থাকে ইতিহাসে বলা হয়েছে বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রভাবে মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ততন্ত্র কি? এতে কিরূপ ভূমি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে?
২। সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বজায় ছিল?
৩। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন ও সামন্তদের জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। নাইট কাদের বলা হত? কিভাবে নাইটকে নির্বাচন করা হত?
৫। সামন্তদের বাসগৃহ সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।
৬। সামন্ততন্ত্রে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল?
৭। ম্যানরের অর্থনৈতিক জীবনধারা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৮। ম্যানরবাসীদের মধ্যে প্রধান তিন শ্রেণী সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।
৯। ম্যানরের বৈষম্যময় জীবনধারার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১০। সার্ফ বলতে কি বোঝ? তাদের জীবনে বংশানুক্রমিক দাসত্ব সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ততন্ত্রে রাজাকে 'পিরামিডের চূড়া' বলা হয়েছে কেন? ২। সামন্ততন্ত্রে উচ্চ পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে নিম্ন পর্যায়ের মানুষের বন্ধন কিরূপ ছিল? ৩। শিভাল্রি বলতে কি বোঝ? ৪। ভিলেন বা স্বাধীন চাষীদের সম্পর্কে যা জান লেখ। ৫। ম্যানরে যাজকেরা কি করত? ৬। ক্যাসেল সম্পর্কে কি জান? ৭। সামন্ত প্রথার সুফল ও কুফল কি?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ**

(ক) সামন্ততন্ত্র হল ভূমির মালিকানা ব্যবস্থা। (খ) নাইটেরা ছিলেন স্বাধীন কৃষক। (গ) উচ্চ পর্যায়ের সামন্তের প্রতি নিম্ন পর্যায়ের সামন্তের আনুগত্যকে বলা হত শিভাল্রি। (ঘ) এবেদুয়ারেরা ছিলেন মধ্যযুগের বীরযোদ্ধা। (ঙ) সার্ফরা ছিলেন মধ্যযুগের স্বাধীন চাষী।

২। **মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ**

(ক) সামন্ততন্ত্র কি? (খ) সামন্ততন্ত্রে সকলের ওপরে কে ছিলেন? (গ) নাইট কাদের বলা হত? (ঘ) সামন্ততন্ত্রে রাজার নীচে কার স্থান ছিল? (ঙ) এবেদুয়ারেরা কি করতেন? (চ) ক্যাসেল কি? (ছ) স্কোয়ার কাদের বলা হত?

৮ | মধ্যযুগের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

খ্রীস্টান আর **ইসলাম** পৃথিবীর দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়। ইউরোপে যেমন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীর বাস, এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে তেমনি ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়। ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য এই দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল। ইতিহাসে এই সংগ্রামই হল **ক্রুসেড** বা **ধর্মযুদ্ধ**।

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য : ক্রুসেড স্পেন দেশের ভাষা—এর অর্থ হল 'ক্রুশ-চিহ্নিত'। ইসলামের অভ্যুত্থানের পরবর্তীকালে খ্রীস্টান তীর্থ জেরুজালেম আরবদের অধিকারে আসে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে খ্রীস্টানদের প্রথমে খুব একটা বিরোধ ছিল না। খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীরা নিরুপদ্রবে তাদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেমে যেতে পারত।

একাদশ শতকে **সেলজুক** নামে তুর্কী জাতির এক শাখা মধ্য-এশিয়া থেকে এসে আরবদের কাছ থেকে সিরিয়া জয় করে নেয়। খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেমে আসতে তারা বাধা দেয় ও নানাভাবে উৎপীড়ন চালাতে থাকে। এই অবস্থায় খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা সকলে মিলে খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপের কাছে উপস্থিত হয়ে সব কথা বললেন। তখন রোমান পোপ ছিলেন **দ্বিতীয় আরবান**। তিনি ফ্রান্সের ক্লেরসেণ্ট নামক স্থানে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের এক মহাসভা আহ্বান করে পুণ্যভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানান। পোপের এই আবেদনের ফলে ইউরোপে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এর ফলে ইউরোপের খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষ একতাবদ্ধ হন। সকলে মিলে পবিত্র খ্রীস্টান রাজ্য গঠন করে বিধর্মীদের জেরুজালেম থেকে বিতাড়নের সংকল্প নিল। ইউরোপের সর্বত্র এক নতুন ধর্মচেতনা দেখা দিল। ধনী, দরিদ্র সকলেই প্যালেস্টাইন আর তার রাজধানী জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হল।

ধর্মীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি ছিল ভারি অদ্ভুত। প্রত্যেকে দু'টুকরা লাল কাপড় জামার ওপর আড়াআড়িভাবে সেলাই করে নিত। তার আকার ছিল ক্রুশের মত। এমনি করে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা তাদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য ধর্মীয় দিক থেকে একপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিল। যারা এমনি করে ক্রুশের প্রতীক গায়ে লাগিয়ে প্যালেস্টাইন উদ্ধারের

জন্য যাত্রা করেছিল, মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে তারা **ক্রুসেডার** বা **ধর্মযোদ্ধা** নামে পরিচিত। আর পবিত্রভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য যে সব যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলিকে বলা হয় **ক্রুসেড** বা **ধর্মযুদ্ধ**।

ধর্মযুদ্ধের সূত্রপাত—সন্ন্যাসী পিটার ঃ এ সময়ে রোমান পোপের বিশ্বস্ত অনুচর **সন্ন্যাসী পিটারের** ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউরোপের জনগণকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। পিটার খালি পায়ে চটের পোশাক পরে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। যেখানে তিনি লোকজনের ভীড় দেখতেন সেখানেই হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর ক্রুশদণ্ড আর বক্তব্য রাখার ধরন ছিল অদ্ভুত। তাঁর হাতে থাকত একটা ক্রুশদণ্ড আর গালভর্তি লম্বা দাড়ি। অনেকে ভাবত পিটার বোধহয় কোন দেবদূত।

এই পিটারের নেতৃত্বেই কয়েক লক্ষ ধর্মান্ধ মানুষ বিধর্মী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এই দলে অনেক চোর-ডাকাতও ছিল। তাদের অমানুষিক অত্যাচারে অনেকেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল। অগত্যা ত্যক্ত-বিরক্ত গ্রামবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রুসেডারদের আক্রমণ করে। এতে কয়েক লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। অনেকে অনাহারে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে যারা প্যালেস্টাইনে গিয়ে পৌঁছাল, তারাও তুর্কী জাতীয় মুসলমানদের আক্রমণে নিহত হল।

অভিযানের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে খ্রীস্টানেরা বুঝতে পারল উচ্ছ্বাস আর ধর্মোন্মাদনা দিয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন। সেজন্য চাই সংগঠন ও অসংখ্য যোদ্ধা। প্রায় দু'লক্ষ সুশিক্ষিত যোদ্ধা সংগৃহীত হল। এই দল ইউরোপের বিখ্যাত সামন্তদের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্যালেস্টাইনের দিকে যাত্রা করল। খ্রীস্টান বাহিনী তীব্র যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন অধিকার করল। তারপর **গডফ্রে** নামে একজন নর্মান নাইট জেরুজালেমের রাজা হলেন। এই অভিযান প্রথম **ক্রুসেড** নামে খ্যাত।

প্রথম ক্রুসেডের পরবর্তী অবস্থা ঃ জেরুজালেমে খ্রীস্টান রাজ্য স্থাপিত হবার পর দুটি ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করা হয়। একদল খ্রীস্টান সন্ন্যাসী দ্বারা একটি সংঘ স্থাপিত হয়। এর নাম হয় **সেণ্ট জনের নাইটদিগের সংঘ**। সেণ্ট জনের হাসপাতাল গৃহটি ছিল এই সংঘের কেন্দ্র। অপর ভ্রাতৃসংঘ গঠন করে একদল নাইট। ইহুদী রাজা সলোমনের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত একটি গৃহে তারা বাস করত। মন্দিরের নামের সাথে জড়িয়ে এই ভ্রাতৃসংঘের নাম হয় **"মন্দিরের নাইট সংঘ"** অথবা **"নাইট টেম্পলারস্"**। পীড়িত ও আহত ক্রুসেডারদের সেবা, খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান,

ধর্মস্থান রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মের জন্য সর্বস্ব পণ করে বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ এসব ছিল ভ্রাতৃসংঘের প্রধান কর্তব্য। পরে আর একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করা হয়েছিল। তাকে **টিউটনিক নাইটদের** সংঘ বলা হত।

সালাদিন ঃ প্যালেস্টাইন খ্রীস্টানদের অধিকারে চলে যাওয়ায় তুর্কী-জাতীয় মুসলমানেরাও নিশ্চেন্ট থাকল না। প্রায় নববই বছর পরে মিশরের সুলতান **সালাদিন** খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে এক "জেহাদ" বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দলে দলে মুসলমান তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। ক্রুশ যেমন খ্রীস্টানদের চিহ্ন ছিল, তেমন **'অর্ধচন্দ্র'** ছিল সালাদিন ও তাঁর যোদ্ধাদের চিহ্ন। সুলতান সালাদিন তুমুল যুদ্ধের পর খ্রীস্টান যোদ্ধাদের পরাজিত করে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করলেন। তিনি বীর, ক্ষমাশীল ও উদার ছিলেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি তিনি অতি উদার ও সহৃদয় ব্যবহার করতেন। তাঁর এই মহত্বের জন্য তিনি শত্রুদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন।


সালাদিন

ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য ও তৃতীয় ক্রুসেড ঃ জেরুজালেমের পতনের সংবাদে সমস্ত ইউরোপ ক্ষুব্ধ হল। তখন জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য পোপ আবার ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইউরোপের খ্রীস্টান রাজারা ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ইংলণ্ডের রাজা **প্রথম রিচার্ড**, **ফ্রান্সের** রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** এবং জার্মান সম্রাট **ফ্রেডারিক বার্বারোসা** প্রত্যেকেই এক একটি বাহিনী নিয়ে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য **১১৮৯** খ্রীঃ যাত্রা করলেন। এই অভিযান **তৃতীয় ক্রুসেড** নামে পরিচিত। কিন্তু তৃতীয় ক্রুসেডে কোন ফললাভ হল না। কারণ খ্রীস্টান রাজাদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। **"সিংহপ্রাণ" রিচার্ড** খুব সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা হলেও সমরকুশল সেনাপতি ছিলেন না। তাছাড়া অতি সামান্য কারণেই তিনি বন্ধুদের সাথে বিবাদে প্রবৃত্ত হতেন। ফরাসীর রাজা ফিলিপ তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। ইতিপূর্বে পথেই ফ্রেডারিকের মৃত্যু হয়েছিল। রিচার্ড একা কিছুকাল সালাদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবশেষে **১১৯২** খ্রীঃ সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্ত হিসেবে জেরুজালেম

মুসলমানদের অধিকারে থাকল। কিন্তু খ্রীস্টানগণ জেরুজালেমে বিনাশুল্কে পুণ্যতীর্থ দর্শনের অধিকার লাভ করল।

চতুর্থ ক্রুসেড : পরবর্তীকালে ১২০২ খ্রীঃ আর একটি ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানালেন পোপ তৃতীয় **ইনোসেন্ট**। ক্রুসেডের যোদ্ধাগণ জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করবার জন্য ভেনিসিয়ানদের সাহায্য প্রার্থনা করল। ভেনিসিয়ানগণ এই সাহায্যের বিনিময়ে **"জারা"** নগর অধিকার করবার জন্য ক্রুসেডারদের প্রতিশ্রুতি দাবী করল। ইতিহাসে এই অভিযান **চতুর্থ ক্রুসেড** নামে পরিচিত। এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। এর পরেও কয়েকবার ক্রুসেডের যুদ্ধ হয়েছিল। ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর বিচক্ষণ সম্রাট **দ্বিতীয় ফ্রেডারিক** পোপের সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন গুণী, জ্ঞানী, আরবী ভাষাবিদ্। তিনি যুদ্ধ না করে মুসলিম সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। ইসলামের খলিফা **আলকামিল** খ্রীস্টান রাজার আরবী জ্ঞান দেখে খুশী হলেন। তিনি বিনাযুদ্ধে খ্রীস্টানদের হাতে যীশুর মাতৃভূমি **নেজারথ**, জন্মভূমি **বেথেলহেম** এবং সমাধিক্ষেত্র **জেরুজালেম** অর্পণ করলেন। **ওমরের** মসজিদ **"ডোম অব দি রক"** মুসলিমদের হাতে থেকে গেল। খ্রীস্টানগণ প্রায় দু'শ বছর যুদ্ধ করে যে দেশ জয় করতে পারেনি, ফ্রেডারিক বিনাযুদ্ধে তা



একটি ক্রুসেড

অধিকার করলেন। অবশ্য ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানগণ পুনরায় জেরুজালেম অধিকার করে। অনেক যুদ্ধ করেও খ্রীস্টানরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে পারল না।

পরবর্তী কয়েকটি ক্রুসেড : প্রায় দু'শ বছর ধ'রে এই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ চলেছিল। সবশুদ্ধ আটটি ক্রুসেড হয়েছিল। ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ক্রুসেডের উন্মাদনা কমতে থাকে, যদিও ক্রুসেড চলেছিল ১২৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কখনও জেরুজালেম খ্রীস্টানদের দ্বারা অধিকৃত হয় আবার কখনও

মুসলমানগণ তা পুনরুদ্ধার করে। অবশ্য শেষে জেরুজালেম মুসলমানদেরই হস্তগত হয়।

ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে খ্রীস্টান যোদ্ধাদের মনে ছিল ধর্মোন্মাদনা। তারা তাই নতুন উৎসাহে বিধর্মীদের মুখোমুখি হয়ে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। এর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। দেশভ্রমণের প্রভাবে অনেকের মনে উদারতা ও বিচার-বুদ্ধি জন্মে। উদ্দীপনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন দেখা দেয়।

সমাজ ও সভ্যতায় ক্রুসেডের প্রভাব : ক্রুসেড শুরু হয়েছিল খ্রীস্টান আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। প্রায় দু'শ বছর ধরে ক্রুসেডের যুদ্ধ চলে। নতুন নতুন দেশ-ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ক্রুসেডারদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। ইউরোপবাসীরা আরবদের কাছ থেকে জীবনযাত্রার অনেক উপকরণ গ্রহণ করে নতুন নতুন আবিস্কার ও উদ্ভাবনে মেতে ওঠে। অনেকের মতে এনামেল, কাচ, বারুদ, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ইত্যাদি আরববাসীর কাছ থেকেই ইউরোপে প্রচলিত হয়। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও আরবদের অবদান অসামান্য। আরবদের প্রভাবে ইউরোপবাসীর জীবন হয় বিলাসবহুল। পাউডার, সেণ্ট, মুক্তার মালা, আয়না প্রভৃতি আরও অনেক কিছু ইউরোপবাসীরা আরবদের কাছ থেকে লাভ করে।

নতুন বাণিজ্য নগরীর উদ্ভব : ক্রুসেডের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয়রা আরবদের প্রভাবে দেশ-বিদেশের সঙ্গে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ভূমধ্যসাগরের তীরে ইটালীতে, ভেনিস, জেনোয়া, মিলান ইত্যাদি বহু ছোট ছোট বাণিজ্য নগরীর সৃষ্টি হয়। তখন জলপথে আরবদেশ থেকে ইউরোপীয় বণিকেরা রেশমবস্ত্র, চিনি এবং লঙ্কা, আদা, লবঙ্গ ইত্যাদি আমদানি করতে শুরু করে। আরও আমদানি হয় রকমারি ফল এবং সাটিন, মখমল, কম্বল এবং রংবেরঙের কাপড়; এসব বিচিত্র দ্রব্য আমদানির ফলে ইউরোপের বণিকেরা প্রচুর অর্থ ও বিত্তের অধিকারী হয়। এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। যতই বাণিজ্যের বিস্তার হতে থাকে—ততই বাণিজ্য নগরীগুলি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে।

কুটিরশিল্পের বিকাশ : ক্রুসেডের আর একটি উল্লেখযোগ্য সুফল হল কুটিরশিল্পের বিকাশ। কৃষির সমান্তরালভাবে কুটিরশিল্প একাদশ ও দ্বাদশ শতক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এতে উৎপাদন ব্যবস্থারও রূপান্তর ঘটে। গ্রামের চাষী যথারীতি চাষবাস শুরু করে। অন্য-দিকে বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা কাঁচামাল দিয়ে কুটিরশিল্পীরা ঘরে বসে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন শুরু করে। যেমন—তাঁত সুতো দিয়ে তৈরী

করল কাপড় ; ছুতার কাঠ দিয়ে তৈরী করল নতুন নতুন আসবাবপত্র। যে যেমনভাবে পারে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হতে থাকল। এতে জীবনধারা বৈচিত্র্য-মণ্ডিত হয়ে উঠল। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

ধর্মযুদ্ধের ফলাফল : ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র জেরুজালেম নগরী মুসলিমদের নিকট থেকে উদ্ধার করা, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তবুও ক্রুসেডের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূর-প্রসারী। (১) ক্রুসেডে তিনটি নাইট সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়, যথা (ক) নাইট টেম্পলারস্—এঁরা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে জেরুজালেমের গীর্জার নিকট বাস করত। (খ) টিউটন নাইটস—এই দলে কেবল জার্মানরাই যোগ দিত, (গ) নাইট হসপিটালস্—তারা আর্ত ও পীড়িতদের সেবা করত এবং বিদ্যালয় চালাত, (২) ক্রুসেডে যোগ দিয়ে ইউরোপের লোকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে, (৩) ক্রুসেডের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটে, (৪) ধর্ম-যুদ্ধের ফলে সামন্ত-প্রথার বিলোপ সাধন হয়। (৫) ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কুটিরশিল্পের প্রসার ঘটে। (৬) ক্রুসেডের ফলে মধ্যযুগের ইউরোপের বদ্ধ জীবনে এশিয়ার সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং এই সকল কারণের জন্য মধ্যযুগের ইউরোপে বহু পরিবর্তনের সূচনা হয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। ক্রুসেড কি ? কেন ক্রুসেড হয়েছিল ?

২। ক্রুসেডের সূত্রপাত হয় কেমন করে ? এতে পিটারের ভূমিকা কি ছিল ?

৩। জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য প্রথম ক্রুসেডের পরে কিরূপ প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল ?

৪। তৃতীয় ক্রুসেড সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৫। সমাজ ও সভ্যতায় ক্রুসেডের প্রভাব কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় আরবান সম্পর্কে কি জান ?

২। গডফ্রে সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। অল্প কথায় সালাদিনের পরিচয় দাও।

৪। সিংহহৃদয় রিচার্ড, ফ্রেডারিক, নাইট টেম্পলারস্ : এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে কেমন করে কুটিরশিল্পের বিকাশ হয় ?

৬। ধর্মযুদ্ধের ফলাফল কি ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। ডানদিকের শব্দগুলির সঙ্গে বামদিকের শব্দগুলির সঙ্গীত সাধন কর ঃ

(ক) দ্বিতীয় আরবান……	(ক) খ্রীস্টান সন্ন্যাসী
(খ) পিটার……	(খ) রোমান পোপ
(গ) রিচার্ড……	(গ) ফ্রান্সের রাজা
(ঘ) চার্লস……	(ঘ) ইংলন্ডের রাজা
(ঙ) জেরুজালেম……	(ঙ) ইসলাম ধর্মাবলম্বী
(চ) সেলজুক……	(চ) খ্রীস্টান তীর্থনগরী

২। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের কর ঃ

(ক) খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থ ছিল—ইংলন্ড/জেরুজালেম
(খ) গড্‌ফ্রে ছিলেন—ফ্রান্সের রাজা/জেরুজালেমের রাজা
(গ) সেলজুক তুর্কীদের নায়ক ছিলেন—জেহাদ/সালাদিন
(ঘ) ক্রুসেড শব্দের অর্থ হল—ধর্মযুদ্ধ/রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

৩। মুখে মুখে উত্তর লিখ ঃ

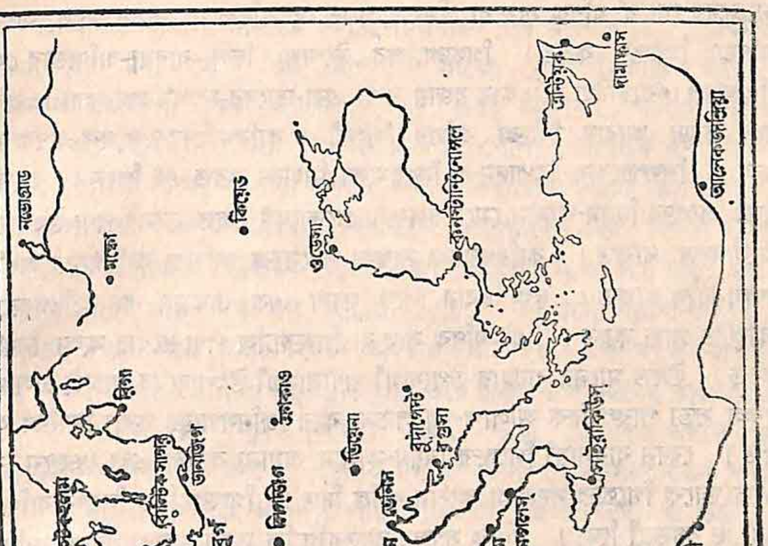
(ক) ক্রুসেড কি? (খ) জেরুজালেম কাদের তীর্থনগরী? (গ) দ্বিতীয় আরবান কে ছিলেন? (ঘ) সেলজুকেরা কোন্ জাতির শাখা? (ঙ) ফেড্রারিক কে ছিলেন? (চ) সিংহহৃদয় কোন্ রাজাকে বলা হত? (ছ) সালাদিনের সঙ্গে রিচার্ড কি সন্ধি করেছিলেন? (জ) আলকামিল কে ছিলেন? (ঝ) যীশু-খ্রীস্টের জন্মভূমি কোন্ নগরী? (ঞ) ক্রুসেড কত বৎসর ধরে চলেছিল? (ট) ভেনিস কোথায়?

৭ | নগর-জীবনের সূচনা

আধুনিক যুগের মত মধ্যযুগের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা গ্রাম ও নগরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহনের উন্নতির ফলে নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে মধ্যযুগে কিন্তু তেমন ছিল না। সেগুলি আকারে ছিল ছোট এবং লোকবসতি ছিল কম। লোকবসতি বৃদ্ধি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বর্তমান যুগের নগরগুলি হয়ে উঠেছে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ। যানবাহনের সুবিধে এবং নিত্য-নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে আধুনিক নগরগুলির আকর্ষণও অনেক বেড়ে গেছে। সেজন্য আধুনিক নগরের মত মধ্যযুগের নগরকে একই রকম ভাবলে মস্ত বড় ভুল করা হবে। তবে সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার মূলে মধ্যযুগের নগরগুলিরও কিছু অবদান ছিল। সেজন্যই আমরা এই অধ্যায়ে মধ্যযুগের নগরগুলির সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করব।

মধ্যযুগে নগরের সূচনা : জিনিসপত্র কেনা-বেচার প্রচলন এযুগের মত মধ্যযুগেও ছিল। সেটা চলত হাটে-বাজারে। যে বিক্রি করতে চাইত সে হাটে যেত। আর যে কিনতে আসত সেও যেত হাটে। আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য সবাই যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনে কিংবা ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে প্রার্থনা করতে গীর্জায় যেত। শিক্ষা-দীক্ষাও কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে হত। সেখানে শিক্ষার্থীরা জড়ো হত। এমনিভাবে বহুলোক সমাগমে কোন বিশেষ অঞ্চল মুখর হয়ে উঠত। এইসব লোকের যাতায়াত এবং কেনা-বেচার জন্যে কিছু সময় থাকার প্রয়োজনে দেখা দিল সাময়িক থাকা ও খাওয়ার জায়গা। এই পরিবর্তনে দেখা দিল ছোট ছোট নগর। এই নগরগুলি কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম কর্ম এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। দশম থেকে একাদশ শতক ব্যাপী ইউরোপে এমনিভাবে অসংখ্য নগর গড়ে উঠেছিল। এই সময় ভেনিস, মিলান, জেনোয়া, প্যারিস, মার্সাই, কোলোন, লন্ডন, ব্রিস্টল প্রভৃতি শহরের নাম শোনা যায়। এগুলি ক্রমশঃ ঐশ্বর্য ও সম্পদে ভরে উঠতে থাকে। এবার গ্রাম কিংবা ম্যানরের অবস্থাপন্ন ধনীরাও নাগরিক জীবনের আকর্ষণ অনুভব করে। সেজন্য তারা এখানে বড় বড় বাড়ি তৈরী করায়। ব্যবসায়ীরা যানবাহন ও বেচা-কেনার সুবিধার জন্য নগরেই তাদের প্রধান কর্মস্থল গড়ে তুলল। এইরূপে ইউরোপে নগর জীবন গড়ে উঠলে একে "**নগর বিপ্লব**" বলা হয়।

নগরের বিকাশে ক্রুসেডের প্রভাব ঃ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রভাবে ইউরোপ-বাসী জলপথে এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। দেশ-বিদেশে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ক্রুসেডারেরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করল। ইউরোপের বণিকেরা

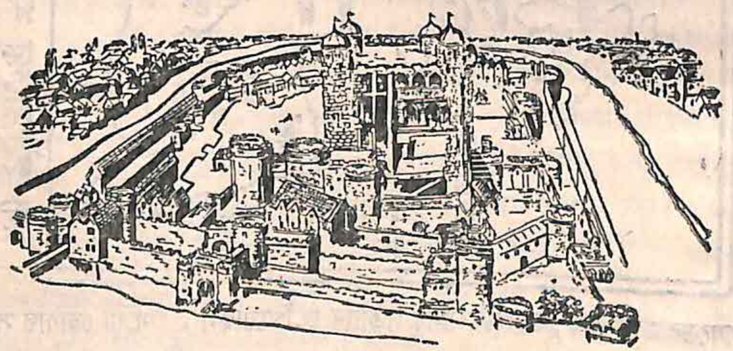


ক্রুসেডের জন্য অর্থ, জাহাজ, রসদ ইত্যাদি জুগিয়েছিল। যুদ্ধ চলবার সময়েই তারা কতকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। কারণ সেখান থেকে তারা দেশ-বিদেশের জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি করত। ধীরে ধীরে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র-গুলিই এক-একটি বাণিজ্য নগরে পরিণত হল। যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনা সত্ত্বেও এসব নগরী ছিল শান্ত ও নিরুপদ্রব। ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থেই এসব

বাণিজ্য-নগরগুলির শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্যই বহু ভাঙাগড়া সত্ত্বেও এসব নগরগুলি ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

গিল্ড বা বণিক সংঘ এবং তার কর্মধারা-ঃ মধ্যযুগে বড় বড় নগরের বণিকেরা নিজেদের স্বার্থে বণিক সংঘ বা গিল্ড গড়ে তুলেছিল। এসব সংঘ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। গিল্ডগুলির উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বণিকদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। বণিক সংঘ ছাড়া আবার বিভিন্ন বৃত্তির শিল্পী ও কারিগরদেরও পৃথক বণিক সংঘ ছিল। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করত এই গিল্ড। প্রত্যেক সভ্য গিল্ডের নিয়ম-কানুন মেনে চলত। প্রত্যেকেই উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত থাকত। কারিগরদের সংস্থার সদস্যেরা অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে শিক্ষানবীশ থাকত। দক্ষ হবার পরে তারা এক একজন দক্ষ কারিগররূপে স্বীকৃতি লাভ করত। এই বণিক সংঘ বা গিল্ডগুলি পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করত। উন্নত মানের ব্যবহার উপযোগী পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালাত। সকল সভ্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করে দিত। কোন ব্যবসায়ী গিল্ডের নিয়ম-কানুন অমান্য করলে এবং ওজনে কম দিলে তাকে গিল্ডের সদস্যরা কঠোর শাস্তি দিত। গিল্ডগুলির নিজস্ব বাণিজ্য-তরী ও রণতরী ছিল। বণিক সংঘের রণতরীগুলি তখন জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করেছিল।

নগরবাসীদের জীবনধারা ঃ মধ্যযুগের নগরগুলি প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। দূর থেকে দেখলে সেগুলিকে মনে হত এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। নগরের রাস্তাগুলি ছিল সরু ও আঁকা-বাঁকা। রাস্তার দুপাশে অনেক বড় বড়



মধ্যযুগের নগর

পাকা বাড়ি ছিল। সেজন্য দিনের বেলায় পথগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকত। রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। নগরগুলি আকারে ছিল ছোট এবং জনাকীর্ণ। সেজন্য

সেগুলি খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিল। নগরগুলি প্রথমে কোন জমিদারের এলাকায় গড়ে উঠেছিল। সেজন্য জমিদারেরা সেগুলি থেকে কর আদায় করত। পরবর্তী নগরগুলিতে পৃথক শাসন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নগরের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তখন বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটির অনুরূপ **নাগরিক সংঘ** গড়ে তুলত। প্রথমতঃ অভিজাতদের মধ্য থেকে এই নাগরিক সংঘের নেতা নির্বাচিত হতেন। একজন নগরাধ্যক্ষ বা **'মেয়র'** নগরের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতেন কয়েকজন নগরপিতা বা **কমিশনার**। পোশাক-আশাকে এবং আদব-কায়দায় নাগরিক সংঘের সভ্যেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল।

স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসন বা চার্টার ঃ মধ্যযুগে নগরগুলি ছিল প্রথমে সামন্ত বা রাজার সম্পত্তি। সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা ছিল সার্ফদের মত। সামন্তেরা তাদের কাছ থেকে কর আদায় করত। কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদেরও অবস্থার উন্নতি হয়। তাদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। এবার নাগরিকেরা যুদ্ধবিগ্রহ করে রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে নিজেদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় করে। তারা নিজেদের নগরে মুদ্রা প্রচলনের অধিকার লাভ করে। প্রত্যেক নগরে স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থার পত্তন হয়। যে দলিল দ্বারা এই অধিকার পায় তার নাম ছিল সনদ্ বা চার্টার। সনদ্ পাওয়ার পর শহরের শাসনব্যবস্থা পৌরসভা ও নির্বাচিত সংস্থার হাতে যায়। বাইরের গণ্যমান্য লোকেরা নির্বাচিত হয়ে শহর শাসনের দায়িত্ব পেল। শহরের নিজস্ব পুলিশ, নাগরিক সেনাদল প্রভৃতি গঠিত হয়। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লণ্ডন, প্যারিস, কোলোন প্রভৃতি শহর স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। বিশেষ করে জার্মান ও ইটালীর নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে খুবই সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। নগরের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি একদল ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তির মনে লোভ ও স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে। অবশেষে একসময়ে সমস্ত ক্ষমতা একদল বণিক সংঘের হাতে চলে আসে।

বুর্জোয়া কথাটির উৎপত্তি ঃ বাণিজ্যের প্রসার, শহরগুলির সমৃদ্ধি ও চিন্তা-ধারার রূপান্তরে ইউরোপের সমাজজীবনে এক পরিবর্তন এল। জমিদার ও ভূমি-দাসের মাঝে একটি নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এরা ছিল স্বনির্ভর, স্বনিয়ন্ত্রিত। এই শ্রেণীটির উদ্ভব হয়েছিল শহর বা বার্গ কথাটি থেকে। মধ্যযুগে শহরে যারা বাস করত তাদেরকে বলা হত **বার্গারস্**। ল্যাটিন ভাষায় এর অর্থ ছিল **বার্জেনসিস্**। ফরাসী ভাষায় এই কথাটিকে বলা হত **বুর্জোয়াজী**।

পরবর্তীকালে বণিকেরা ধনবান হয়ে সমাজে ধনতন্ত্র-স্থাপন করে। আগে জমির মালিকরাই ছিল শক্তিশালী। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। তারা এমন আইন রচনা করে যার বলে বণিকেরা লাভবান

হয় এবং কারিগর ও শ্রমিকেরা শোষিত হয়। বিংশ শতকের সময়ে রুশ-বিপ্লবের ফলে দেশে দেশে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে। তারই ফলে বুর্জোয়াদের প্রভাব ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে কেমন করে নগরের উদ্ভব হয়েছিল? নগরের বিকাশে ক্রুসেডের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। গিল্ড বা বণিক সংঘের কার্যধারা সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৩। মধ্যযুগের নগর ও নগরবাসীর জীবনধারা সম্পর্কে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের নগরগুলির শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

২। চার্টার সম্পর্কে কি জান?

৩। বুর্জোয়া শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে বল। মধ্যযুগের নগরের সঙ্গে এ যুগের নগরের পার্থক্য কি ছিল?

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) তবে — মানুষের অর্থনৈতিক ও — জীবনধারার মূলে মধ্যযুগের নগরগুলিরও কিছু অবদান ছিল। (খ) ব্যবসায়ীরা — ও — সুবিধার জন্য নগরেই তাদের প্রধান কার্যালয় গড়ে তোলে। (গ) সাধারণভাবে — বলতে বোঝাত — বা কল-কারখানার মালিক।

২। মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) মধ্যযুগের নগরগুলির আকার কেমন ছিল? (খ) নগরীর শাসন চালাত কারা? (গ) গিল্ড কি? (ঘ) চার্টার বলতে কি বোঝ? (ঙ) মধ্যযুগের নগরগুলির রাস্তাঘাট কেমন ছিল?

১০

॥ মধ্যযুগের সুদূর-প্রাচ্য ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ চীনের কথা

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম হল চীনদেশের সভ্যতা। প্রাচীন যুগের মত মধ্যযুগেও এদেশের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইউরোপে যখন খ্রীস্টান আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মের নামে চলেছিল রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ—চীনের রাজারা তখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সকল ধর্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন।

একদিকে পাহাড়-পর্বতের প্রাকৃতিক বাধা, অন্যদিকে চীনের মহাপ্রাচীরের ব্যবধান এ দেশকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মহিমা। বুদ্ধদেবের অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী চীনদেশের মানুষের মধ্যে সঞ্চার করেছে নতুন আদর্শ। অন্য দেশে যখন যোদ্ধা ও সৈনিকেরা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে—চীনবাসীরা তখন যুদ্ধকে ঘৃণা করেছে। দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে এদেশ হয়েছে সমৃদ্ধশালী।

রাজনৈতিক দিক থেকে এদেশের স্বতন্ত্র ধারা মধ্যযুগেও বজায় ছিল। বাইরের অভিযানকারীরা চীনে প্রবেশ করে সহসা প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনি। এখানে একাধিক রাজবংশের রাজত্ব চলেছে—স্থায়ী হয়েছে বেশ কয়েক শতাব্দী। যেমন—**চৌ, চীন, সুই, তাং, সুঙ্** আরও কত কি। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে তাঙ্ রাজাদের আমল থেকেই চীনের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল।

তাঙ্ রাজবংশ (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) : সপ্তম শতকের সূচনা থেকে দশম শতকের সূচনা কাল পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী চীনে তাঙ্ রাজাদের শাসন চলেছিল। এ যুগে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল।

রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন : তাঙ্ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন তাঙ্-তাই-সুং। তাঙ্ বংশ যখন প্রথম সিংহাসন অধিকার করে তখন চীন ছিল খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন এবং তাতার আক্রমণে বিব্রত। সম্রাট তাঙ্-তাই-সুং তাতারদের চীন দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন এবং একে একে বিভিন্ন খণ্ডরাষ্ট্রগুলি জয় করে সমস্ত চীন জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঙ্ সাম্রাজ্যের মত এত বড় বিরাট সাম্রাজ্য চীনে ইতিপূর্বে আর কেউ স্থাপন করতে পারেননি। পামীর, মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ইন্দোচীনের একাংশ

এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশ তখন চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়েই তাঙ্ বংশের রাজ্যসীমা পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে **আলতাই পর্বতশ্রেণী** স্পর্শ করেছিল। তাঙ্ সাম্রাজ্যের রাজধানী **চাঙ্-আন** শহর ছিল অতি বিশাল। সমস্ত দেশের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটির উপর।

তাঙ্-তাই-সুংকে চীনের লোকেরা **"সিং-হোয়াং"** অর্থাৎ **"সম্রাট শিরোমণি"** অ্যাখ্যা দিয়েছিল। তাঁর সভায় নেপাল, মগধ, পারস্য ও কনস্টাণ্টিনোপলের সম্রাট দূত পাঠিয়েছিলেন। সিরিয়া থেকে খ্রীস্টান প্রচারকরা এসে ঐ সময়ে চীন দেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে থাকে। কথিত আছে, হজরত মহম্মদ তাঙ্-তাই-সুং-কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আবেদন পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ে ক্যাণ্টনে একটি মসজিদ স্থাপিত হয় এবং চীনের অধিবাসী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। তাঙ্ বংশের রাজত্বকালে পারস্যের জরথুস্ট্র প্রবর্তিত ধর্মও চীন দেশে প্রচারিত হয়।

রাজ্য শাসনের জন্য কনফুসিয়াস যে সকল নিয়ম করে গিয়েছিলেন তাঙ্-তাই-সুঙ তা মেনে চলতেন। তাঙ্-তাই-সুঙের রাজত্বকালে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। চীন কৃষি, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করে।

তাঙ্ বংশের আর একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন **মিং-হুয়াং**। তিনি অতিশয় সদাশয় নরপতি ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসাধারণ উন্নতি হয়। তাঙ্ বংশের সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন **চু-ওয়েন**। তিনি ছিলেন দুর্বল ও অপদার্থ। তাঁর শাসনকালে চীনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এরই সুযোগ নিয়ে সুঙ্ বংশীয়রা চীনের সিংহাসন দখল করে।

তাঙ্ যুগে বহুমুখী সমৃদ্ধি ঃ তাঙ্ যুগে বহুমুখী সমৃদ্ধি দেখা দেয়। আইন, শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য এ যুগে অসাধারণ অগ্রগতি লাভ করেছিল। এ যুগেই চায়ের প্রচলন হয়। ছাপার মেসিন উদ্ভাবিত হয়েছিল এ যুগেই। শিল্পের বিকাশের দিক থেকেও এ যুগ খুব উল্লেখযোগ্য।

আইন ঃ সাঙ্ রাজাদের রাজত্বকালে বাধ্যতামূলক সামরিক দাসবৃত্তির পেশা থেকে চাষীরা মুক্তি পায়। প্রাণদণ্ডাদেশ তুলে দেওয়া হয়। নানা দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস পায়।

শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা ঃ তাঙ্ রাজারা শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে এ যুগে চীনে ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। তখন শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, দর্শন ইত্যাদি। এ সময়ে চৈনিক ভাষায় বহু বৌদ্ধ পুঁথি অনুদিত হয়েছিল। রাজারা জ্ঞান-বিজ্ঞান

চর্চায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঙ্-তাই-সুং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে গভীর-ভাবে অধ্যয়ন করতেন। তিনি এ বিষয়ে একখানা বইও লিখেছিলেন।

সাহিত্য : সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক থেকেও তাঙ্ যুগ সমগ্র চীনের মধ্যযুগের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এযুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন চীনের প্রসিদ্ধ কবি লি-পো। সুন্দর সুন্দর গীতিকবিতা তিনি রচনা করতেন। তাঁর কবিতার ভাব ও ভাষা ছিল সহজ ও সরল। সেগুলির আবেদনে পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে এ যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি তু-ফো। মিং-হুয়াং কাব্যরসিক সম্রাট ছিলেন এবং তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন।

চায়ের প্রচলন : তাঙ্‌যুগেই চীনে প্রথম চায়ের প্রচলন হয়। তখন অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের জন্য পানীয় হিসাবে চা দেওয়া হত। পরবর্তী কালে চীন থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চায়ের প্রচলন শুরু হয়।

মুদ্রণযন্ত্র : মুদ্রণযন্ত্রও তাঙ্ যুগের আর একটি অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলেই শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়।

শিল্প : তাঙ্ যুগে চীনের বড় বড় প্রাসাদের দেওয়াল ও সুদৃশ্য মৃৎপাত্র



তাঙ্ যুগের শিল্প

চিত্র-বিচিত্র করে তোলা হত। চৈনিক শিল্পকলা এ সময় থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও কৃষির উন্নতি : তাঙ্ রাজাদের আনুকূল্যে দেশ-বিদেশের সঙ্গে এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। রেশম, পশম, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি পণ্য চীন থেকে অন্যদেশে পাঠান হত। চীনদেশের বাণিজ্যতরী তখন ভারত মহাসাগর এবং পারস্য উপসাগরে চলাচল করত। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে চীনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

তাঙ্‌ সম্রাটেরা কৃষক ও কৃষির উন্নতির প্রতিও খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সার্ফদের মুক্তি দেন। চাষীদের অবস্থার উন্নতির দিকে তাঁরা খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন।

চীন থেকে জাপান ও কোরিয়ায় চীনা সভ্যতার প্রসার : তাঙ্‌ যুগেই চীনা সভ্যতা স্বদেশের বাইরে জাপান, কোরিয়া, আনাম ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোরিয়ার রাজ পরিবারের সন্তানেরা চীনে লেখাপড়া শিখতে আসতেন। কোরিয়ার মাধ্যমে চৈনিক সংস্কৃতি প্রথমে জাপানে প্রবেশ করে. তারপর চীনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। ইন্দোচীনে চৈনিক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। এসব অঞ্চলে চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা প্রচলিত ছিল। চীনাদের অনুকরণে লিপিমালা গড়ে ওঠে।

হিউয়েন-সাঙের ভারত পর্যটন ও তার প্রতিক্রিয়া : আমরা আগেই জেনেছি চীনের প্রধান ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। তাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে যুগে যুগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। চীনে তাঙ্‌ রাজাদের সময়ে প্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ পর্যটক **হিউয়েন সাঙ** ভারতে আসেন। তিনি গোবি মরুভূমি ও ইসিককুল হ্রদ পার হয়ে তুর্কীস্থানে চলে আসেন। মধ্য এশিয়ার এই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সমরখন্দ হয়ে কাবুল ও কাশ্মীরের পথে ভারতে আসেন। ভারতে এসে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এদেশে তিনি বহুকাল অতিবাহিত করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে হিউয়েন-সাঙ্‌ বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু পুঁথি, নানা রকম বুদ্ধমূর্তি ও চিত্র সাথে করে নিয়ে যান। এগুলি নিয়ে যেতে হিউয়েন-সাঙের কুড়িটি ঘোড়া লেগেছিল। চীনে ফিরে আসার পরে তাঙ্‌ সম্রাটেরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন। হিউয়েন-সাঙ্‌ চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। হিউয়েন-সাঙের অনুসরণে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীন থেকে ভারতে যেতে শুরু করেন। আবার ভারত থেকেও বহু বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক চীনে যান। এমনিভাবে ভারত ও চীন দেশের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আজও চৈনিক সভ্যতা অনেকাংশে ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। চীনাদের প্রচেষ্টার ফলেই দেশ-বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারিত হয়।


হিউয়েন-সাঙ্‌

সুঙ রাজাদের আমল (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ) ঃ সুঙ রাজাদের আমলে চীনের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। **চাও-কুয়াং-ইন** সুঙবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চীনাবাসীদের কাছে তিনি "আইন" নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্ব-কালে চীনা নতুন ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ হয়। সারা দেশে ঐশ্বর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এই বংশের আর একজন বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন **তাই-সুঙ**। তিনি চীনের খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ করেন। এই বংশের আর একজন সম্রাট ছিলেন চেন-সুঙ। তিনি চীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং চীনে এক নতুন ধর্মমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। চেন-সুঙের পরবর্তীকালে জেন-সুঙ ও সেন-সুঙের আমলে চীনে নানা দিক থেকে পরিবর্তন দেখা দেয়। চীন দেশে বাণিজ্য, কৃষি, ঋণ—সকল ব্যাপারে সংস্কার শুরু হয় এ সময় থেকেই।

সুঙ যুগের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ঃ সুঙ রাজারা নানা দিক থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। এসব সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। এসব সংস্কারগুলির ফলে চীনের সমৃদ্ধির পথে অসুবিধা-গুলি দূর হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ তাঙ্ রাজাদের মত সুঙ রাজারাও জলপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন। বিদেশী বণিকদের চীনে এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তখন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনও কোনও পণ্যের ওপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। সরকার নির্ধারিত ব্যবসায়ীরা সেই সব পণ্যের ব্যবসা চালাত। তখন জিনিসের মূল্যের ওপর শুল্ক ধার্য করা হত। এ সময় চীনারা সমুদ্র পথে বিদেশে যেতে আরম্ভ করেছিল এবং সেই উপলক্ষে তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে-ছিল। চীনারা ধূপ, চন্দন, হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিঙ, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি আমদানি-রপ্তানি করত। সোনা, রূপা, বিশেষত তামার টাকার রপ্তানি খুবই বেড়ে গিয়েছিল। সুঙ রাজত্বকালে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাগজের মুদ্রার ব্যবহারই সে যুগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ ঃ চীনের প্রচলিত করদান প্রথামত সকল দেশের থেকে ফসল রাজধানীতে প্রেরণ করা হত। এই প্রথায় রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হত ও দরিদ্রের দুর্গতিরও সীমা ছিল না। এই সব অসুবিধা থেকে রাষ্ট্র ও প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য **ওয়াং-আন-সি** একটি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্যগোলা স্থাপন করা হল এবং সেই গোলায় কর হিসাবে স্থানীয় শস্য মজুত রাখবার ব্যবস্থা হল। প্রয়োজনমত সরকার এই শস্য অন্যত্র পাঠিয়ে বিক্রি করতেন।

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিঋণ দান ঃ সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা

করবার জন্য রাষ্ট্র থেকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমি বন্ধক রেখে কৃষক ঋণ গ্রহণ করত চাষ আরম্ভের প্রথমে, আর সেই ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করত শস্য সংগ্রহের পর।

জমির জরিপ ও কর ধার্যকরণ ঃ জমি জরিপ করে নতুনভাবে কর ধার্য করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক জমির ওপর ন্যায্য কর ধার্য করা। অনুর্বর জমি, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি করযোগ্য জমির তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

সুঙ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ সুঙ যুগে ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, পদ্য ও গদ্য প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রেরও নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সাহিত্য রচনার বিপুল উদ্যম সম্ভব হয়েছিল গ্রন্থ ছাপার কল্যাণে। এ যুগের একটি বিশেষ রচনা "বিশ্বকোষ"। সুঙ যুগের খ্যাতি অতুলনীয় চিত্র-শিল্পের জন্য, প্রাকৃতিক রম্য দৃশ্যে অঙ্কনই ছিল সে শিল্পের প্রাণবস্তু। সুঙ যুগ চিত্রশিল্পে উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠেছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন **চেং-সু-সিয়াংও**। সুঙ সম্রাট পুই-সুঙ্ ছিলেন একজন কৃতি শিল্পী, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্প-রসিক। চীন দেশে তিনিই প্রথম শিল্প আকাদেমি স্থাপন করেন। সম্রাট শিক্ষাদানে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করতেন, চিত্রের বিচার ও সমালোচনা করতেন। সুঙ যুগে পোর্সিলেনের উৎকর্ষ চরম শিখরে উঠেছিল। পোর্সিলেন নানা জায়গায় তৈরী হত। রাজধানী কাই-কোং নগরে সম্রাটের নিজস্ব কারখানা ছিল। সুঙ যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, মন্দির, গৃহ-সজ্জা সবই ছিল অপূর্ব। বস্ত্রবয়ন, ধাতু পাথরের কাজে অনুপম শিল্পকুশলতা ফুটে উঠেছিল।

ইউয়ান বংশ ঃ হূণ ও তুর্কীদের মত মঙ্গোলরাও ছিল এক শক্তিশালী, সাহসী, যুদ্ধপ্রিয় যাযাবর জাতি। চীনের উত্তরে মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ মরুময় দেশ ছিল তাদের বাসভূমি। ছোট ছোট তাঁবুতে তারা বাস করত। ঘোড়ায় চড়ে তারা যাতায়াত করত এবং ঘোড়ার মাংস ও দুধ তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধ করে তারা জীবন কাটাত। তীর ও ধনুক ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র এবং তাদের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। গ্রাম ও নগর পত্তন করে বাস করা মঙ্গোলরা মোটেই পছন্দ করত না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা এক একজন সর্দারের অধীনে বাস করত।

চিঙ্গিজ খাঁর দিগ্বিজয় ঃ ত্রয়োদশ শতকে একজন সমর-নায়কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মঙ্গোল জাতি একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দিগ্বিজয়ে বের হল। মঙ্গোলদের এই নায়ক ইতিহাসে **চিঙ্গিজ খাঁ** নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। চিঙ্গিজের আসল নাম ছিল **তেমুচিন**। চিঙ্গিজ নিজে এক জন অতি সুদক্ষ

সৈনিক ছিলেন এবং একে একে অন্যান্য মঙ্গোল সর্দারদের পরাজিত করে একটি শক্তিশালী রাজ্যের সর্বেসর্বা হলেন। তখন মঙ্গোল জাতি তাঁকে **কেগান** পদে মনোনীত করল। এই সময় চিঙ্গিজের বয়স ছিল একান্ন বৎসর।



চিঙ্গিজ খাঁ

চিঙ্গিজের মত প্রতিভাশালী সামরিক নেতা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্রাট পদ লাভ করে তিনি রাজ্যজয়ে অগ্রসর হলেন। প্রথমেই তিনি উত্তর-চীনের কিন্-তাতার সাম্রাজ্য জয় করে নিলেন। এর রাজধানী ছিল **পিকিং**। তারপর তিনি কোরিয়া অধিকার করলেন। এরপর চিঙ্গিজের সাথে মধ্য-এশিয়ার **খাওয়ারিজম** রাজ্যের শাহের বিবাদ বাধল। চিঙ্গিজ খাওয়ারিজম রাজ্য আক্রমণ করেন, তাঁর এই আক্রমণে রাজ্যটি ধ্বংস হয়ে যায়। **সমরখন্দ** ছিল সে সময়ে মধ্য-এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগর এবং সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র। নগরে প্রবেশ করে মঙ্গোলরা সেখানকার অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করল। **বোখারা, বল্খ, নিশাপুর** প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী নগর ভস্মীভূত হল। **হিরাট** অঞ্চলে ১৬ লক্ষ লোক বাসস্থান হারাল।

চিঙ্গিজ খাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর সামাজ্য পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে পশ্চিমে ইউরোপের নীপার নদীর তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল **কারাকোরাম**। চিঙ্গিজ খাঁ একজন রক্তপিপাসু সাম্রাজ্য-বিজেতা ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁর একজন চীনাদেশীয় মন্ত্রী ছিলেন—**থিয়েলিউ সুতসেই**। তিনি ছিলেন দয়ালু ও গুণবান। তাঁর পরামর্শে চীনের বহু সুন্দর সুন্দর নগর ও শিল্পকীর্তি মঙ্গোলদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

কুবলাই খান : চিঙ্গিজ খাঁর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কুবলাই খান। তিনি ১২৫৫ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র মঙ্গোল জাতির সম্রাট বা 'খান' রূপে অভিষিক্ত হন। কুবলাই খানের রাজত্বকাল কতকগুলি কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, তিনি কারাকোরাম থেকে তাঁর রাজধানী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পিকিং-এ স্থানান্তরিত

করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ব্যাপারে তিনি উদার ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। তৃতীয়তঃ, কুবলাই খানকে চীনাবাসী তাদের সম্রাটরূপে গ্রহণ করেছিল। চতুর্থতঃ, কুবলাই খানের সময় থেকেই মঙ্গোল সর্দারেরা এশিয়া-ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। কুবলাই খানের রাজত্বকালেই প্রসিদ্ধ ভিনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো চীনে আসেন এবং কুবলাই খানের দরবারে আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি একটি বিবরণী লেখেন। তা থেকেই কুবলাই খানের শাসন কাল সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।



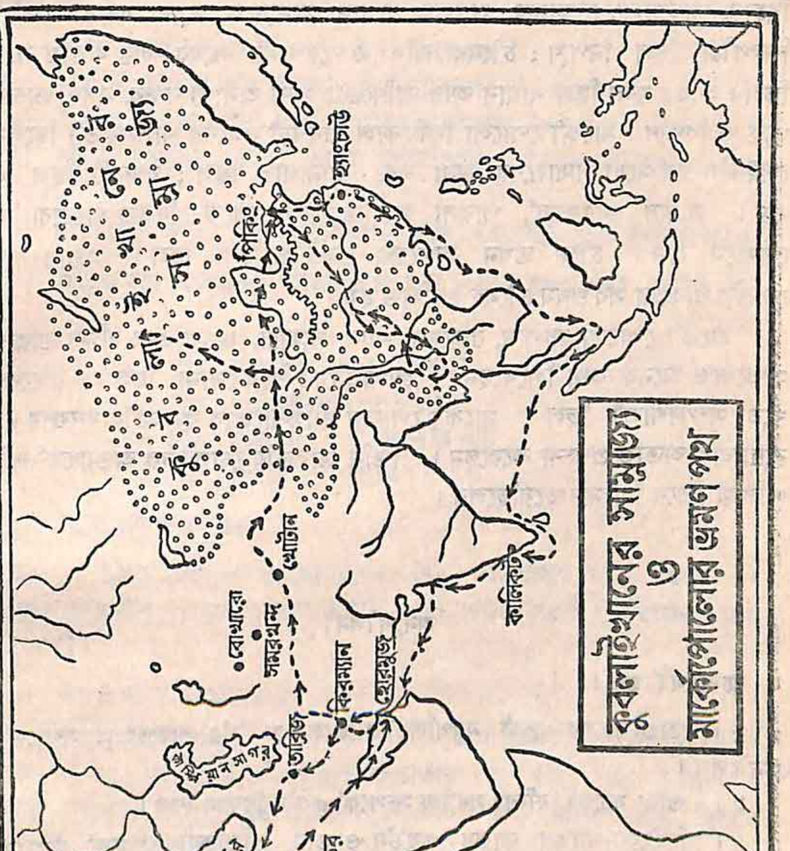
কুবলাই খান

কুবলাই খানের রাজত্বকালকে মোঙ্গল শাসনের **স্বর্ণ যুগ** বলা হয়। তিনি চৈনিক সাংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির ও পরধর্মমত সহিষ্ণু। তিব্বতী বর্ণমালার ধাঁচে তিনি মঙ্গোলদের বর্ণমালা পরিবর্তন করেছিলেন। ১২৯৪ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৩৬৮ খ্রীঃ চীনে এক বিরাট বিদ্রোহ হয়। ফলে চীনদেশ থেকে ইউয়ান বংশ ধ্বংস হয়।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী ঃ ইটালীর ভেনিস নগরে **নিকলো পোলো** ও **মাফিও পোলো** নামে দুইভাই বাস করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১২৭৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা চীনে যান। তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নিকলোর ছেলে **মার্কো পোলো**। পোলোরা প্রায় সাড়ে তিন বছর পর পিকিং-এ উপস্থিত হলেন। মার্কো পোলো খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি এই সময়ের মধ্যেই চীনা ও মঙ্গোল ভাষা শিখে নিয়েছিলেন।

পিকিং-এ আসার পর মার্কো পোলোর সঙ্গে কুবলাই খানের পরিচয় হয়। মার্কো পোলোকে সম্রাটের খুব ভাল লাগল। তিনি তাঁকে নিজের উচ্চ রাজ-কর্মচারী পদে নিয়োগ করলেন। কালক্রমে মার্কো পোলো একটি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। ষোল বছর চীনে বাস করবার পর পোলোরা স্বদেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন। কিন্তু সম্রাটের অনুমতি পাওয়া গেল না। পরে সুযোগমত পোলোরা সমুদ্রপথে রওনা হলেন এবং পরে সুমাত্রা ও দাক্ষিণাত্য হয়ে পারস্যে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা দেশের দিকে রওনা হলেন।

প্রায় চব্বিশ বছর পরে পোলোরা ভেনিসে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁদের তখন কেউ আর চিনতে পারল না। তারপর তাঁরা আত্মীয়-স্বজনকে এক



সভায় আহ্বান করে নিজেদের পরিচয় দিলেন ও ধনরত্নাদি দেখানোর পরে তাদের সন্দেহ দূর হয়।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে কুবলাই খানের দরবারের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। কুবলাই খানের সাম্রাজ্য ছিল সুবিশাল। সমস্ত দেশব্যাপী বৌদ্ধ বিহার, পান্থশালা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ফুলের বাগান মানুষকে মুগ্ধ করত। চীনের শিল্পীরা ছিল নিপুণ; চীনের জরি ও রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্র অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কৃষির জন্য ছিল খামার আর বাণিজ্যের জন্য অসংখ্য বন্দর, নগর, ভান্ডার, গৃহ ও বিপণি। মার্কো পোলো কিছুকাল হান-চৌ নগরের শাসনকর্তা ছিলেন। সেই নগরের মধ্যে সাধারণের জন্য বহু স্নানাগার ছিল; বন্দরটি ছিল খুব বড়। সুদূর ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বণিকরা পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে যান। চীনে তখন কাগজের নোট প্রচলিত ছিল। মুদ্রার বদলে নোটের ব্যবহার সর্বপ্রথম চীনেই প্রচলিত হয়।

মার্কো পোলো জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, সুমাত্রা, জাভা এবং দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছেন। জাপানীদের প্রচুর সোনা ছিল। ব্রহ্মদেশও খুব সম্পদশালী ছিল। মার্কো পোলো দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় রাজ্যের রাণী রুদ্রাম্বার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। তিনি ভারতীয় যোগীদের অত্যাশ্চর্য শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। তাঙ্-বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। তাঙ্ যুগের বিভিন্ন সমৃদ্ধি সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৩। হিউয়েন-সাঙের ভারত পর্যটন ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। সুঙ রাজাদের সময় (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য, (খ) বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ, (গ) জমির জরিপ ও কর ধার্যকরণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। চিঙ্গিজ খাঁ কে ছিলেন? তাঁর দিগ্বিজয়ের একটি বিবরণ দাও।

৬। কুবলাই খানের রাজত্বকাল কি কি কারণে উল্লেখযোগ্য?

৭। মার্কো পোলো কে ছিলেন? তিনি কুবলাই খানের শাসনকাল সম্বন্ধে কি বিবরণ দিয়েছেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে কোন্ কোন্ দিক থেকে চীনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়?

২। মিং-হুয়াং সম্পর্কে পরিচয় দাও।

৩। সুঙ যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কি জান ?

৪। মঙ্গোলদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। মধ্যযুগে চীনে কখন ও কিভাবে বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল ?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রকৃত উত্তরটি খুঁজে চিহ্নিত করে (√) দেখাও ঃ

(ক) চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন—তু-ফো/লি-পো/মিং-হুয়াং।

(খ) চিঙ্গিজ খাঁর রাজধানী ছিল—পিকিং/কারাকোরাম/সমরখন্দ।

(গ) চীনের 'সম্রাট শিরোমণি' আখ্যা পেয়েছিলেন—তাঙ্-তাই-সুং/মিং-হুয়াং/চু-ওয়েন।

(ঘ) চীনে প্রথম চায়ের প্রচলন হয়েছিল—তাঙ্ যুগে/সুঙ যুগে/ইউয়ান যুগে।

২। নীচের বাম দিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডান দিকের শব্দগুলির সঙ্গতি সাধন কর ঃ

(ক) তাঙ্-তাই-সুং…পর্যটক
(খ) হিউয়েন-সাঙ……রাজা
(গ) মঙ্গোল……রাজধানীর নাম
(ঘ) পিকিং……জাতির নাম।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) — চীনে প্রথম — প্রচলন হয়। (খ) কাব্যরসিক সম্রাট ছিলেন —। (গ) চাও-কুয়াং-ইন — বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (ঘ) সুঙ সম্রাট — ছিলেন একজন কৃতি শিল্পী।

৪। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) তাঙ্ বংশের কখন প্রতিষ্ঠা হয় ? (খ) কোন্ সম্রাট জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেছিলেন ? (গ) সুঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বল। (ঘ) চিঙ্গিজ খাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ? (ঙ) মার্কো পোলো কোন্ দেশের লোক ছিলেন ? (চ) পিকিং কার রাজধানী ছিল ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের জাপানের কথা

পূর্ব-প্রাচ্যে চীনের পরেই জাপানের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। চীন কিংবা ভারতবর্ষের তুলনায় জাপানের প্রাচীন ইতিহাস একেবারেই সমৃদ্ধিহীন। এশিয়া মহাদেশের পূর্বাংশে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পাঁচটি প্রধান এবং আরও কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশটি গঠিত হয়েছে। জাপানের আদিবাসীরা সম্ভবত ছিল **আইনু** নামে পশ্চিম এশিয়ার এক যাযাবর জাতিগোষ্ঠী। এখানে সভ্যতা-সংস্কৃতি যা কিছু গড়ে উঠেছে তা দেখে বোঝা যায় মধ্যযুগে আইনু ছাড়াও দক্ষিণ-এশিয়া থেকেও একদল লোক জাপানে এসেছিল। এসব বিচিত্র জাতির মানুষ নিয়ে তৈরী হয়েছে জাপানীরা। পরবর্তীকালে কোরিয়া থেকে একদল চীনা জাপানে আসে। এর ফলে জাপানে চৈনিক প্রভাব দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় জীবনধারার যা কিছু বৈশিষ্ট্য জাপানীদের জীবনধারায় তা পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছিল। সেজন্য সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে জাপানের কথা বিশেষভাবে জানা দরকার।

সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ ঃ মধ্যযুগের সূচনা পর্বে জাপানে বহু চাষযোগ্য জমি ছিল। সেগুলির মালিক ছিল ধনী ও অভিজাতরা। চাষবাস করে সেখানে ফসল ফলাত ভূমিহীন চাষী বা সার্ফেরা। জমির মালিকেরা রাজাকে কর দিতেন। আগে রাজার অধীনেই ছিল এসব জমি। কিন্তু করের বোঝা বাড়বার ফলে দরিদ্র কৃষকেরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন ঐ সব চাষযোগ্য জমি **সামুরাই** বা বীরযোদ্ধারা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। জমির মালিকানা হস্তান্তর হওয়ার ফলে মধ্যযুগে জাপানে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হয়। এছাড়া বৌদ্ধমঠের অধীনেও অনেক চাষযোগ্য জমি ছিল। কৃষকদের দুরবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। সাধারণ চাষীরা করের চাপে এক সময়ে ভূমিহীন চাষী বা সার্ফে পরিণত হয়। এই দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য **টকুগাওয়া** বংশীয় শাসকেরা সমস্ত রাষ্ট্রীয় জমি ১৫০ জন অভিজাতের মধ্যে ভাগ করে দেন। এদের বলা হত **দাইমিও**। দাইমিওরা অঞ্চল বিশেষে স্বাধীনতা ভোগ করতেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতেন **সোগানেরা**। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল। তারা বংশানুক্রমে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সামুরাইদের মধ্যে ছিল অভিজাত শাসক **দাইমিও** এবং সাধারণ সৈনিক। সাধারণ সৈনিকরা অবশ্য সকল রকম অধিকার ভোগ করতে পারত না। কারণ তারা তাদের মনিব দাইমিও বা জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারাই পরিচালিত হত।

চাষীদের জীবন ছিল চরম দুঃখে ভরা। করের বোঝায় তারা অনেক সময় জমি ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করত। কখনও বা সাধারণ চাষী ভূমিহীন ক্রীতদাস বা সার্ফের জীবন যাপনে বাধ্য হত। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমাজে ব্যবসায়ীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সমাজে অভিজাত, সৈনিক, ব্যবসায়ী, কৃষক, কারিগর ইত্যাদি ভিন্ন আরও বহু শ্রেণী ছিল। ভারতবর্ষের অনুরূপ জাপানেও এক বিশেষ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। সেটা অনেকাংশে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—আবার অনেক দিক থেকে বৈসাদৃশ্যও ছিল।

মিকাডোর প্রাধান্য : চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক :

চীনের মত জাপানেও একজন সম্রাট ছিলেন—তাঁর উপাধি ছিল **'মিকাডো'**। জাপানীদের ধারণা ছিল সম্রাট বা 'মিকাডো' হলেন সূর্যবংশীয় দেবতা। দেবতা এসে মানুষের মধ্যে জন্মেছেন, তাই মিকাডো ছিলেন পূজার প্রতিমা বা পুতুলের মত। কেউ তাঁকে সহজে ছুঁতে বা দেখতে পেত না। দেববংশে জন্ম এই রকম ধারণা ছিল বলে মিকাডোকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখত। তাই মিকাডো ছিলেন নামেমাত্র সম্রাট—তিনি রাজত্ব করতেন কিন্তু শাসন করতেন না। দেশের শাসন বা শোষণের সব রকমের সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন সোগানেরা। সম্রাট সামান্য পূজো পেয়েই খুশী থাকতেন। এই সোগানদের শাসন কর্তৃত্ব চলেছিল ১৯ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক : জাপানের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহুদিন আগেই গড়ে উঠেছিল। চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। জাপানে ত্রিপিটকের অনুবাদ বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জাপানী ভাষা ও লিপি চৈনিক ভাষা ও লিপির প্রভাবে গড়ে উঠেছে। তাই জাপানী ভাষায় বহু চীনা শব্দ মিশে গেছে। এখনও চীনা শব্দের সঙ্গে চীনা হরফগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জাপানের সিপিংগো নামকরণ চীনারাই দিয়েছিল। চীনাদের প্রভাবেই কোরিয়া থেকে রেশম শিল্পের বিকাশ হয়েছিল জাপানে। চা ও কাগজের প্রচলনও হয়েছিল এই চীনাদের সংস্পর্শে আসার জন্য। সেদিক থেকে চীন ও জাপান-পূর্ব প্রাচ্যের এ দুটি দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্যিই উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক দিক থেকে চৈনিক সম্রাট কুবলাই খান জাপান জয়ের জন্য দু'বার নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তথাপি দুটি দেশের সম্পর্ক দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

বৃহৎ পরিবারগুলির ক্ষমতা হ্রাস : জাপানের গোষ্ঠী ও বংশানুক্রমে কতকগুলি বড় বড় পরিবার অন্যদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। মিকাডো ছিলেন নামেমাত্র সম্রাট—প্রকৃত শাসন ক্ষমতা সেই বড় বড় পরিবার-

গুলির হাতেই ছিল। একটি বড় পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবারের সংঘাতের পরিণতিতে কখনও কখনও গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হত। তারপর এক ক্ষমতাশালী পরিবার অন্য সকলকে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ছাড়িয়ে যেত। জাপানের ইতিহাসে এই পর্বকে বংশানুক্রমিক প্রাধান্যের পর্ব বললে ভুল হবে না। পরবর্তীকালে এই সব প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তির উপাধি হয় সোগান। কার্যক্ষেত্রে এই সোগানরাই ছিলেন সর্বনিয়ন্তা। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে সোগানদের আধিপত্যের অবসান ঘটে।

শিণ্টো পুরোহিত ও গোষ্ঠী প্রাধান্য ঃ শিণ্টো ধর্মমত ঃ জাপানীরা প্রকৃতির পূজারী। এখানকার প্রাচীন ধর্মমত হল শিণ্টো। শিন্টো কথাটির অর্থ হল **'দেবতার পথ'**। আসলে আইনুদের জাতীয় ধর্ম শিণ্টো কালক্রমে সমগ্র জাপানের জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। জাপানের অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভা এখানকার অধিবাসীদের প্রকৃতি পূজারীতে পরিণত করে তুলেছিল। তাই সকুরা ফুল যখন বাগান আলো করে ফোটে জাপানীরা তখন এক মনে বাগানে বসে তা দেখে। জাপানীদের ধারণা মানুষের জ্ঞান-বিদ্যা ও সৌন্দর্যবোধ সব কিছুই দেবতার কাছ থেকে পাওয়া। পূর্বপুরুষ না থাকলে এই পৃথিবীতে জন্মান যেত না। তাই জাপানীরা ভক্তিভরে পূর্বপুরুষকে বন্দনা করে। শিণ্টো ধর্মমত হল প্রধানতঃ প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পূজা। মিকাডো হলেন সূর্য-বংশীয়—দেবতার সমান তাঁর মর্যাদা। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতেন মিকাডো। তাঁর নামে কর্তৃত্ব চালাতেন শিণ্টো পুরোহিতেরা। দেশ শাসনের নাম করে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন তাঁরা। ধর্মের নামে আজগুবি ব্যাখ্যাও তাঁরা সমাজে প্রচলন করতেন। কখনও বা মিকাডোর নাম করে তাঁরা তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামত দেশ চালাতেন। দেশের লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা না করে শিণ্টো পুরোহিতেরা তাঁদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই বেশি দৃষ্টি দিতেন। কিন্তু গোষ্ঠী প্রাধান্যের ফলে শিণ্টো পুরোহিতদের প্রাধান্য লোপ পায়। আগেই বলা হয়েছে, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকে কোন কোন প্রভাবশালী অভিজাত পরিবার বা সোগানই হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা। দেশ শাসন ব্যাপারেও তাঁরা একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। এর ফলে ধর্মীয় প্রধান হিসাবে শিণ্টো পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যায়।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঃ মিকাডো ও শিণ্টো পুরোহিতদের সর্বময় কর্তৃত্ব অবসানের আর একটি কারণ হল জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার। চীন থেকে কোরিয়ার মারফত জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কালক্রমে ছোট ছোট জমিদার সোগানদের রাজ্যগুলি এক-একটি বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রে পরিণত

হয়। বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর পরে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মের মত ও পথকে কেন্দ্র করে অনেক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। জাপানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জাপানে বুদ্ধের নামে যত বেশি সম্প্রদায় আছে পৃথিবীর আর কোথাও তা নেই। জাপানে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও মূর্তি আছে। পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধের সব থেকে বড় মূর্তি 'দাই বুদসু' জাপানেই রয়েছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পুঁথি এদেশের একটি মঠে এখনও রয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে জাপানে শিন্টো পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে আসে। বৌদ্ধধর্ম ও শিন্টো ধর্মের সমন্বয়ে এখানকার ধর্মমত গড়ে ওঠে। দেশ শাসন ও পরিচালনার ব্যাপারে শিন্টো পুরোহিতদের পরিবর্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। মিকাডো ও সোগানেরাও এঁদের প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সমাজে অবাধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকেন।

সোগান ঃ সামুরাই ঃ বুসিডো ঃ

সোগান ঃ 'সোগান' কথাটির অর্থ সামরিক প্রধান বা প্রধান সেনাপতি। দ্বাদশ শতকে মিনিমাতো পরিবারের যোরিতামো নামে এক ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। মিকাডো তাঁকে সোগান উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর দীর্ঘ সাত বছর ধরে বিভিন্ন বংশের সোগানেরাই জাপানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। যোরিতামোর রাজধানীর নাম ছিল **কামাকুরা**। সেজন্য এ যুগের সোগানদের বলা হয় কামাকুরা। তবে এঁদের শাসনকালে দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় ছিল। চতুর্দশ শতকে **আশিকাগা** নামে সোগান বংশের শাসনকালে জাপানে চীনের প্রভাবে চিত্রাঙ্কন, কাব্য, গৃহনির্মাণ, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার চর্চা হয়। সপ্তদশ শতকে তোকুগাওয়া সোগানদের সময়ে **'জেদো'** নগর স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এই জেদোই বর্তমান **টোকিও** নগরে রূপান্তরিত হয়। এই তোকুগাওয়া বংশের শাসনের সময় জাপানে বিদেশীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। অন্যদিকে জাপানীরাও বিদেশে যেতে পারত না। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে জাপান পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। অবশেষে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জাপানের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সামুরাই ঃ বুসিডো ঃ সামুরাইরা ছিল প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায়। যুদ্ধ-বিগ্রহে তারা লিপ্ত থাকত। সামুরাইরা তাদের প্রভুর প্রতি অনুগত থাকত। বড় বড় দাইমিওদের অধীনে সামুরাইরা কাজ করত। সামুরাইরা নাইটদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময়েই প্রতিবাদ করত।

সামুরাইদের মর্যাদাসূচক আচরণকে জাপানী ভাষায় বলা হত বুসিডো। কাজ-কর্ম ও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে সামুরাইরা দ্বৈত আচরণ করত। নাইটদের মত তারাও কৃত্রিম যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধে পরাজিত হলে



সামুরাই

কিংবা শত্রুর হাতে অপমানিত হলে সামুরাইরা বৌদ্ধধর্মের নিয়ম অনুসারে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করত। এসব কিছুই বুসিডো বা বীরের ধর্মরূপে গণ্য হত।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। মধ্যযুগে জাপানের সমাজে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার বিকাশ সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। মধ্যযুগে জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৩। মধ্যযুগে জাপানের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৪। সোগান কাদের বলা হত? সোগানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মিকাডো বলতে কি বোঝ? মিকাডো সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। শিণ্টো পুরোহিতদের ক্ষমতা কিভাবে কমে গিয়েছিল?

৩। সামুরাই কাদের বলা হত?

৪। মধ্যযুগে জাপানে কেমন করে বড় বড় পরিবারগুলির প্রভাব কমে গিয়েছিল?

৫। বুসিডো বলতে কি বোঝ?

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) — চীনের পরই জাপানের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। (খ) — সূচনা পর্বে জাপানে বহু — জমি ছিল। (গ) — সঙ্গে চীনের — দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহুদিন আগেই গড়ে উঠেছিল। (ঘ) জাপানীরা — পূজারী। এখানকার প্রাচীন ধর্মমত হল —।

২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) জাপানের সম্রাটের উপাধি ছিল সামুরাই।

(খ) শিণ্টো হল জাপানের সামরিক প্রধান।

(গ) শিণ্টো ধর্মের প্রভাবে মধ্যযুগে জাপান থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দূর হয়।

৩। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) জাপান দেশটি কোন্ মহাদেশে অবস্থিত? (খ) জাপানের সম্রাটের উপাধি কি? (গ) জাপানের আদিবাসী কারা ছিল? (ঘ) কোন্ ভাষার প্রভাবে জাপানের লিপি ও ভাষা গড়ে উঠেছে? (ঙ) জাপানে কখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়? (চ) দাই বুদসু কি? (ছ) যোরিতামোর রাজধানীর নাম কি? (জ) জেদো নগর কখন স্থাপিত হয়েছিল?

১১ | মধ্যযুগের ভারতবর্ষ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এশিয়া-ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে কেমন করে বহু ছোট-বড় রাজা ও রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল—আর তাদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য কি রকম সংঘর্ষ চলত সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে পাঠ করব। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও তার পরবর্তী পর্যায় থেকে ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল। তারপর রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দেয় ও এক বিশৃংখল এবং অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছোট-বড় বহু রাজ্য গড়ে ওঠে। রাজারা নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন।

(১) **ভারতবর্ষ ও হূণ আক্রমণ ঃ** খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হূণ নায়ক এটিলার নেতৃত্বে হূণদের একটি দল পশ্চিম ইউরোপে বেপরোয়া অভিযান চালায়। ভারতেও হূণদের আর একটি দল এসে অভিযান চালিয়েছিল। তারা **শ্বেতহূণ** নামে পরিচিত। প্রথমে পারস্যে অভিযান চালাবার পরে হূণরা উত্তর ভারতে এসে হাজির হয়। সে সময়ে ভারতে গুপ্ত রাজারা প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্ত ও তারপর স্কন্দগুপ্তের প্রবল প্রতিরোধের ফলে হূণরা প্রথমবার পিছু হটে। স্কন্দগুপ্ত যতদিন জীবিত ছিলেন—ততদিন হূণেরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করার সাহস দেখাতে পারেনি।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে উপযুক্ত রণকুশলী ও দক্ষ রাজার অভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়। হূণেরা তারই সুযোগ গ্রহণ করে। গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর হূণরা প্রবলভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালায়। এই সময় হূণ আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লবে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। হূণদের প্রধান নায়ক ছিলেন তোরমান। গুপ্ত রাজাদের পরাজিত করে তিনি হূণদের ক্ষমতা মালব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় **বালাদিত্য** নামে এক গুপ্ত সম্রাটের কাছে তোরমান পরাজিত হয়েছিলেন।

তোরমানের পর তাঁর পুত্র **মিহিরগুল** বা **মিহিরকুল** শ্বেতহূণদের রাজা হন। তিনিও খুব পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবে ও পূর্ব মালবে নিজের অধিকার স্থাপন করেছিলেন। পাঞ্জাবের **শাকল** বা **শিয়ালকোট** নগর ছিল তাঁর রাজধানী। মিহিরগুল অত্যন্ত নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন।

বৌদ্ধদের উপর মিহিরগুল অমানুষিক অত্যাচার করতেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষের কয়েকজন রাজা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করেন। তাঁদের নেতা ছিলেন সম্রাট বালাদিত্য। বালাদিত্য মিহিরগুলকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। বীর ও উদার বালাদিত্য পরাজিত শত্রুকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন। তারপর মিহিরগুল কাশ্মীর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে কাশ্মীরের রাজাকে হত্যা করেন ও কাশ্মীর অধিকার করেন। তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে কুষাণ যুগের স্তূপ, মূর্তি এবং বিহার ধ্বংস করেন।

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে মালবের পরাক্রান্ত রাজা যশোধর্মন হূণদের পরাজিত করে হূণশক্তি খর্ব করেন। এর পরেও কিছুকাল হূণ নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমে রাজত্ব করেছিলেন।

হূণ আক্রমণের গুরুত্ব ঃ ভারতের ইতিহাসে হূণ আক্রমণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মিহিরগুলের সামরিক প্রাধান্য ব্যতীত বিভিন্ন ভারতীয় রাজশক্তিকে কর্তৃত্বে আনা হূণশক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। যশোধর্মন, নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, ঈশানবর্মন প্রভৃতি একাধিক ভারতীয় রাজগণের নিকট পরাজিত হওয়ার ফলে হূণশক্তি কেবল আফগানিস্তান ও কাশ্মীরেই প্রভাব বিস্তার করে।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিফল হলেও সামাজিকক্ষেত্রে হূণজাতির ভারতে প্রবেশের ফল গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। কালক্রমে হূণরা ভারতের জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কথিত আছে, হূণ রাজারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হিন্দু রাজকন্যাদের বিয়ে করে হিন্দু সমাজের সাথে মিশে গিয়েছিলেন।

হিন্দু ও হূণদের সংমিশ্রণে ভারতে রাজপুত নামে এক নতুন জাতির উদ্ভব হয়। হূণ রাজারা অনেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের অনেকের



তোরমানের মুদ্রা

মুদ্রায় মহাদেবের বাহন বৃষ বা ষাঁড়ের মূর্তি আঁকা আছে। ষষ্ঠ শতকের একেবারে শেষের দিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হূণ আক্রমণের বিভীষিকা

বজায় ছিল। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন হূণদের পরাজিত করে খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন : খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষে পরাক্রান্ত গুপ্তরাজ বুধগুপ্তের মৃত্যু হয়। তারপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। গুপ্তরাজ বালাদিত্যের রাজত্বকালে আত্মকলহ, হূণ আক্রমণ ও মালবরাজ যশোধর্মনের উত্থানের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। বালাদিত্যের পুত্র তৃতীয় কুমারগুপ্ত ও পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত পর পর সিংহাসনে বসেন। তাঁরা গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাঙন রোধের জন্য নিস্ফল প্রচেষ্টা চালান।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা চলেছিল তা সপ্তম শতকে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে। উত্তর-ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ আবার একজন রাজার শাসনাধীন হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে হর্যবর্ধনের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। সপ্তম শতকে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

হর্ষবর্ধন : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় এক শতাব্দী ব্যবধানে পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরে **পুষ্যভূতি** বংশের উত্থান ঘটে। পুষ্যভূতি বংশীয় পরাক্রান্ত রাজা প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন **হর্ষবর্ধন**। উত্তর-ভারতের এক বিরাট অঞ্চল জয় করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে মগধ, উড়িষ্যা, গঞ্জাম এবং উত্তরে হিমালয় পর্বত থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুজরাটের বলভী রাজ্যও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপের রাজা তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর আনুগত্য মেনে চলতেন।



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল কনৌজ। সে যুগে কনৌজ ছিল শ্রেষ্ঠ নগর। এর আর একটি নাম ছিল "মহোদয়শ্রী"। প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত কনৌজ নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় আট কিলোমিটার ও প্রস্থে প্রায় দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। বহু সুরম্য অট্টালিকা, উদ্যান ও সরোবর এই শহরের শোভাবর্ধন করত। নাগরিকদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। নগরবাসীর সংখ্যাও ছিল অনেক। চেহারা ও রুচিতে নাগরিকদের বেশভূষা মার্জিত ছিল এবং তারা দামী রেশমের পোশাক পরত। নগরের মধ্যে একশত বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং সেখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র লেখাপড়া ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করত।

হর্ষবর্ধনের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন সিংহাসন লাভ করেন। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার রাণী ছিলেন। কনৌজ তখন মৌখরী রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজপদ গ্রহণ করে রাজ্যবর্ধন খবর পেলেন যে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে এক যুদ্ধে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হয়েছেন। তখন রাজ্যবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করে দেবগুপ্তকে পরাজিত করলেন, কিন্তু শশাঙ্কের হাতে নিজে নিহত হলেন। এর পর থানেশ্বর ও কনৌজের অমাত্যগণ হর্ষবর্ধনকে দুই রাজ্যেরই রাজা বলে নির্বাচিত করলেন।

শাসনভার গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন ভগ্নীকে উদ্ধার করেন এবং থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্কের বিরুদ্ধেও হর্ষবর্ধন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ককে তিনি পরাজিত করতে পারলেন না। শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেছিলেন।

বিদ্যানুরাগ : হর্ষবর্ধন পণ্ডিতদের খুব সমাদর করতেন। তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন বাণভট্ট। বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে হর্ষবর্ধনের একখানি জীবনী লিখে গিয়েছেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙও হর্ষবর্ধনের সভায় অনেকদিন ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের লিখিত বিবরণ এবং বাণভট্টের রচিত **হর্ষচরিত** এই দুখানি গ্রন্থ থেকে হর্ষবর্ধন ও তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়।

হর্ষবর্ধন যেমন ছিলেন বীর, তেমনই ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও দানশীল। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি কনৌজে এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করে সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন। একবার কনৌজে তিনি এক ধর্মসভা আহবান করেন। সেখানে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, জৈন সাধু ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ২০ জন করদ ও মিত্র রাজা উপস্থিত হয়েছিলেন।

দানশীলতা : হর্ষবর্ধনের সময় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটি উৎসব হত। এই উৎসবটি ছিল অনেকটা বর্তমান কুম্ভমেলার মত। ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে শ্রমণ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে এই উৎসবে যোগদান করতেন। উৎসবে বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের পূজা হত। তিনমাস ধরে এই উৎসব চলত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হর্ষবর্ধন সকলকে ধনরত্ন, বস্ত্র দান করতেন। তিনমাস পর্যন্ত এভাবে দান করে যখন সঞ্চিত সমস্ত কিছু নিঃশেষ হত,

তখন তিনি নিজের কাপড়খানি দান করে রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখানি কাপড় নিয়ে পরতেন। এ রকম দানের কাহিনী ইতিহাসে আর শোনা যায় না।



প্রয়াগে হর্ষবর্ধন দান করছেন

উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন। বীরত্ব ও সামরিক দক্ষতার দ্বারা বিশৃংখলার যুগেও তিনি সমগ্র উত্তরাপথে ঐক্য আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ের ফলে তিনি **'সকল উত্তরাপথনাথ'** আখ্যা লাভ করেন। তাঁর খ্যাতি সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি চীন সম্রাটের সাথে দূত বিনিময় করেছিলেন। কনৌজের ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের পরিচয় "কুমার শিলাদিত্য" নামে পরিচিত। এই সময় থেকে কনৌজ নগরী উত্তরাপথে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। হর্ষবর্ধন একজন কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত **রত্নাবলী** ও **প্রিয়দর্শিকা** নাটক থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। উদার, ধর্মপ্রাণ, দানশীল, গুণগ্রাহী ও সাহিত্যানুরাগী হর্ষবর্ধন বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও প্রজাদের কল্যাণকেই রাজ্যের কল্যাণ বলে মনে করতেন। মহারাজ হর্ষবর্ধনের মত এত সদ্‌গুণের অধিকারী সম্রাট ইতিহাসে সত্যই বিরল।

হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ কাহিনী ঃ আমরা আগের একটি অধ্যায়ে হিউয়েন-সাঙের ভারত পর্যটন সম্পর্কে পাঠ করেছি। বর্তমান অধ্যায়েও হিউয়েন-সাঙ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পাঠ করবো। বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন এবং ধর্মপুস্তক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু চৈনিক শ্রমণ ও পরিব্রাজক যুগে যুগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঙ্ সম্রাট 'তাঙ্-তাই-সুং'-এর রাজত্বকালে কয়েকজন অনুচর-সহ গোবি মরুভূমির পথে হিউয়েন-সাঙ ভারতের দিকে যাত্রা করেন। মরুভূমির মধ্যে তাঁকে অশেষ দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছিল। তিয়েন-সান পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে গিরিপথ অতিক্রম করার সময় হিউয়েন-সাঙ-এর বার জন সহযাত্রী প্রবল হিমপ্রবাহের ফলে মৃত্যু বরণ করেন।

কিন্তু সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করেও হিউয়েন-সাঙ চলতে লাগলেন এবং মধ্য-এশিয়ার **কারাসর** ও **সমরখন্দের** পথে **গান্ধারে** এসে পৌঁছান। মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করবার সময় তিনি তুর্কী জাতির 'খান' উপাধিধারী একজন রাজার দরবারে উপস্থিত হন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং তাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করলেন।

তুর্কীস্তান থেকে হিউয়েন-সাঙ সমরখন্দে উপস্থিত হলেন। তখনকার সময়ে সমরখন্দ ছিল মধ্য-এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এখানে উৎকৃষ্ট ঘোড়া ও নানারকম শিল্পজাত জিনিসের বেচা-কেনা চলত। সমরখন্দ থেকে হিউয়েন-সাঙ এলেন বাহ্লীক দেশে। সেখানে কিছুদিন থেকে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন।

চৌদ্দ বছর ভারতবর্ষে থেকে হিউয়েন-সাঙ এদেশের প্রায় সকল জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। প্রায় আট বছর তিনি হর্ষবর্ধনের রাজ্যে ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে, তখন ভারতের অনেক প্রাচীন বড় বড় নগর ও গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আবার জনাকীর্ণ নগর ও সমৃদ্ধ গ্রামও ছিল অসংখ্য। পাটলিপুত্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কনৌজ সমৃদ্ধশালী নগর ছিল।

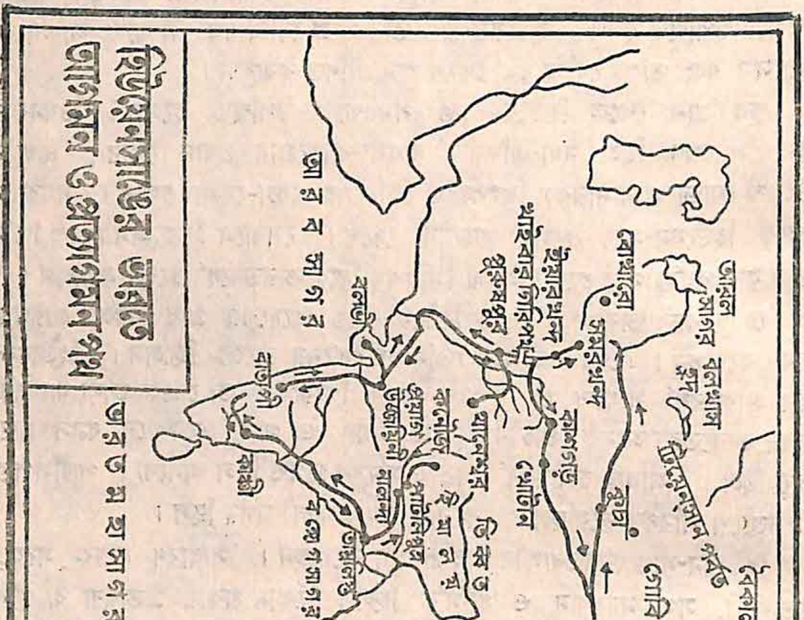
হিউয়েন-সাঙ ভারতবাসীর খুব প্রশংসা করেছেন। সাধারণ লোক সরল, সত্যবাদী, সৎ, ন্যায়বান ও ধার্মিক ছিল। কোন প্রকার প্রতারণা বা হীন কাজ করাকে তারা ঘৃণার চোখে দেখত। ভারতবাসীর বেশভূষার বাহুল্য ছিল না। সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ তারা ব্যবহার করত। নানা রং-এর কারুকার্য করা পোশাকের তখন বেশ সমাদর ছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে শাসন-ব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। রাজা নিজে সকল বিষয়ে দেখাশুনা করতেন। প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা ছিল। রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এখানে চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। দেশের সর্বত্র অতিথিশালা ও অতিথিদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল।

ভারতে তখন শিক্ষার খুব সমাদর ছিল। হাজার-হাজার বিদ্যালয়ে অগণিত ছাত্র অধ্যয়ন করত। হিউয়েন-সাঙের সময়ে **নালন্দা** বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এশিয়ার সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল।

হিউয়েন-সাঙ দাক্ষিণাত্যের চালুক্য, পল্লব প্রভৃতি রাজ্যে গিয়েছিলেন। চালুক্যরাজ **দ্বিতীয় পুলকেশী** শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর শৌর্যবীর্যের এবং চালুক্য রাজ্যের অধিবাসীদের বীরত্বের খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বাদামী ও অজন্তার গুহামন্দির দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেছেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চিপুর হয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে পল্লবরা সাহসী, বিশ্বাসী, পরোপকারী ও বিদ্যোৎসাহী ছিল। সে



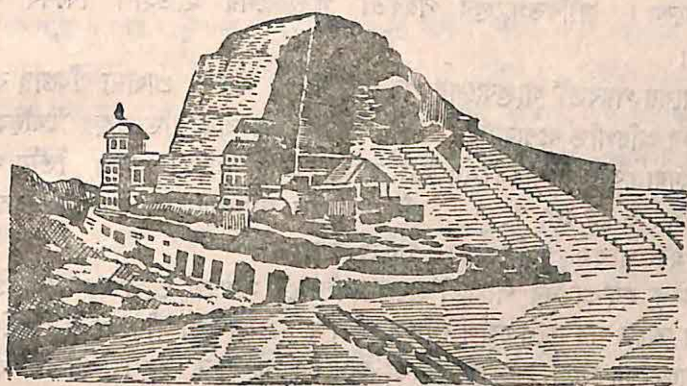
যুগে পল্লব স্থাপত্যশিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মার রাজত্বকালে মামল্লপুরম নামক স্থানে পাহাড় কেটে সাতটি পূর্ণাঙ্গ

মন্দির বা রথ নির্মাণ করা হয়। মন্দিরগুলির নির্মাণ কৌশল ও শিল্পরীতি দেখলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়।

হিউয়েন-সাঙ ভারতের নানা জায়গা পর্যটন করে অবশেষে মধ্য-এশিয়ার পথে চীনে ফিরে যান। তিনি বহু ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। চীন সম্রাট তাঙ্‌-তাই-সুং বিপুল সমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মধ্যযুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। হিউয়েন-সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ ও গ্রন্থাগার পরিদর্শনের জন্য আসেন। এখানে তিনি পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে নালন্দার সুদীর্ঘ বিবরণ আছে। বর্তমানে বিহার প্রদেশে পাটনা জেলায় **বড়গাঁও** নামক গ্রামের কাছে মাটি খুঁড়ে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

নালন্দা ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। হর্ষবর্ধনের সময়ে এই বিহারের চরম উন্নতি লাভ হয়। তখন এখানে এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এসে অধ্যয়ন করত। ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে একশত গ্রাম দান করা হয়েছিল। এই সব গ্রামের আয় থেকেই ছাত্রদের আহার, পোশাক এবং ঔষধের জন্য ব্যয় করা হত।

মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান থেকে ছাত্ররা এসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। ভর্তির আগে ছাত্রদের শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হত।

হিউয়েন-সাঙের সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন একজন বাঙালী। তাঁর নাম **শীলভদ্র**। সে সময়ে শীলভদ্রের মত পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর ছিলেন না। হিউয়েন-সাঙ কয়েক বছর নালন্দায় থেকে শীলভদ্রের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

নালন্দার ছাত্র ও শিক্ষকেরা সবসময়ই শাস্ত্রচর্চায় রত থাকতেন। এখানে ছাত্ররা ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, শিল্প, গণিত, রসায়ন, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে চলতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধাবলী ও উঁচু বুরুজগুলি দেখে হিউয়েন-সাঙ বিস্মিত হয়েছিলেন।

(২) **হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর ভারত** : হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য পুনরায় বিনষ্ট হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে প্রথম প্রতিপত্তি অর্জন করে পরবর্তী গুপ্তরাজগণ শাসিত **মগধরাজ্য**। এই রাজ্যের রাজা মাধবগুপ্তের পুত্র **আদিত্যসেন** একাধিক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। আদিত্যসেনের পর **দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত** ও **জীবিতগুপ্ত** সিংহাসন লাভ করেন। জীবিতগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তবংশের ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না।

মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশের পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেন কনৌজের অধিপতি **যশোবর্মন**। তাঁর সভাপণ্ডিত বাক্‌পতিরাজের **"গৌড়বহো"** নামক কাব্য থেকে যশোবর্মনের দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব-দিকে মগধ ও বঙ্গ জয় করেন। দক্ষিণে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজাকে পরাজিত করেন এবং পশ্চিম পারসিকদেরও পরাস্ত করেন।

কিন্তু হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে এইভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চলছিল তাতে সব চেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন কাশ্মীররাজ **ললিতাদিত্য**। হূণ আক্রমণের ফলে কাশ্মীর সম্ভবতঃ হূণদের অধিকৃত হয়। কার্কট বংশের প্রতিষ্ঠাতা **দুর্লভবর্ধন** পরবর্তীকালে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়**। তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান চালান। সম্ভবতঃ তিনি **মগধ, বঙ্গ** ও **সিন্ধু** ইত্যাদি জয় করেন। সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়া নগর নির্মাণ, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় খ্যাতি অর্জন করেন।

পরবর্তীকালে **অবন্তীবর্মন** উৎপল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে ছিলেন **আনন্দবর্ধন, রত্নাকর, শংকরবর্মন, চক্রবর্মন** ও **উন্মাত্তবতী**। এই বংশের সম্রাটগণ তন্ত্রীণ, একাঙ্গ ও অভিজাতগণের স্বেচ্ছাচার দমন করে

কাশ্মীরকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেন। ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে উৎপল বংশের অবসান ঘটে।

১০৭০ খ্রীস্টাব্দে সংগ্রামরাজ লোহর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লোহর বংশের কৃতি নরপতি ছিলেন **হর্ষ**। তিনি আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দূর করে এবং বিদ্রোহ দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন জয়সিংহ।

ভারত ইতিহাসে রাজপুত যুগ ঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান কর্তৃক উত্তর-ভারত জয়ের সময়কাল হল "রাজপুত যুগ"। এই সময় রাজপুত সম্প্রদায় বা জাতি ভারতের ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে রাজপুত প্রাধান্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না।

আরবদের ভারত জয়ের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা এবং দীর্ঘকাল আফগান ও তুর্কী জাতীয় মুসলমানদের আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করার কৃতিত্ব রাজপুত জাতির। যখন রাজপুতগণ এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখনই সমগ্র উত্তর-ভারত মুসলমান কর্তৃক বিজিত হল, দক্ষিণ-ভারতেও মুসলমান অধিকার স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিল।

রাজপুত বংশের অভ্যুত্থান ঃ রাজপুতগণ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিল। কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় রাজপুতগণের দান উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে ক্ষত্রিয়-রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়েছিল। গুর্জর প্রতিহার, চন্দেল্ল, পরমার, চাহমান ও গুজরাটের চালুক্য বংশ নতুন রাজবংশরূপে গুরুত্ব লাভ করে। হিন্দু ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা যথার্থই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজপুতগণের মধ্যে সম্ভবতঃ ভারতীয় ও বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

গুর্জর প্রতিহার বংশ ঃ ত্রিশক্তির সংগ্রাম ঃ রাজপুত রাজবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম গুর্জর প্রতিহার বংশই বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করে। সাম্রাজ্যস্রষ্টা প্রতিহার বংশ **প্রথম নাগভট্টের** সময় থেকে প্রতিপত্তি অর্জন করে। তিনি আরব আক্রমণ প্রতিহত করে যশ অর্জন করেন। রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা **দন্তীদুর্গ** প্রথম নাগভট্টকে পরাজিত করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার বংশের মধ্যে যে সংঘর্ষের সূচনা হল, তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং কালক্রমে বাংলাদেশের পালবংশ এই সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করলে একটি ত্রিশক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। প্রথম নাগভট্টের পরবর্তী দুজন রাজা **কক্কুক** ও **দেবরাজ** সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরবর্তী নরপতি **বৎসরাজ** প্রতিহার শক্তির গৌরব বৃদ্ধি

করেন। তিনি আনুমানিক ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মালব ও পূর্ব-রাজপুতানা তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ত্রিশক্তি সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রতিহারগণ সব-সময়েই রাষ্ট্রকূট ও পালবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত। কনৌজ অধিকার এই সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বহু জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত প্রতিহারগণই সাফল্য অর্জন করে এবং কনৌজে তাদের রাজধানী স্থাপিত করে।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়ে বৎসরাজ সম্ভবতঃ পালরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করে তাঁর রাজছত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে বৎসরাজ প্রবল বাধার সম্মুখীন হলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ **ধ্রুব** প্রথমে বৎসরাজ ও পরে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু ধ্রুবের ব্যস্ততার সুযোগে ধর্মপাল কনৌজে প্রাধান্য স্থাপন করেন। কনৌজের রাজা **ইন্দ্রায়ুধ** ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করেন। এইভাবে ত্রিশক্তির সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

বৎসরাজের পুত্র **দ্বিতীয় নাগভট্ট** প্রতিহার সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় নাগভট্ট মুঙ্গেরের নিকট পাল সম্রাট ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং তাঁর আশ্রিত কৌনজরাজ চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ-এর পর ধ্রুবের পুত্র রাষ্ট্রকূটরাজ **তৃতীয় গোবিন্দের** সাহায্যপ্রার্থী হন। তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারত অভিযানে দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের গোলমালের জন্য তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারত ত্যাগ করলে ধর্মপাল ও তাঁর পুত্র দেবপাল শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করেন।

দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র **মিহিরভোজের** নেতৃত্বে ত্রিশক্তি সংগ্রামের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। মিহিরভোজ শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। তিনি দেবপালের বংশধর **নারায়ণপাল** ও **অমোঘবর্ষের** উত্তরাধিকারী **দ্বিতীয় কৃষ্ণের** বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে জয়লাভ করেন।

ভোজের পুত্র **মহেন্দ্রপালের** সময়ে প্রতিহার সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতিলাভ করে। ত্রিশক্তি সংগ্রামের চতুর্থ পর্বে মহেন্দ্রপালের নেতৃত্বে প্রতিহার সাম্রাজ্য হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত ও পূর্ব সমুদ্রতট থেকে পশ্চিম সমুদ্রতট পর্যন্ত প্রসারলাভ করেছিল।

মহেন্দ্রপালের পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় ভোজ** অল্পকাল রাজত্ব করবার পর তাঁর ভ্রাতা **প্রথম মহীপাল** সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ মহীপাল রাষ্ট্রকূটদের বিরুদ্ধে প্রথম সাফল্যলাভ করেছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ **তৃতীয় ইন্দ্রের** নিকট তিনি পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হয়েও মহীপাল প্রতিহার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথম মহীপালের পর থেকেই প্রতিহার রাজ্যের দুর্বলতা দেখা দেয়।

সামন্ত রাজগণ ক্রমেই প্রবল হতে থাকে এবং সম্রাটের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। কালক্রমে চন্দেল্ল, পরমার চেদি (কলচুরি), চাহমান, গুজরাটের চালুক্য গাহড়বলবংশ প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে প্রতিহার সাম্রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্রতর করতে থাকেন।

(৩) **প্রাচীন বাংলা ঃ** প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে গৌড়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রভূমি, সমতট, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মৌর্য ও গুপ্তবংশীয় রাজারা সম্ভবতঃ বাংলাদেশ অধিকার করেছিলেন। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে তিনজন স্বাধীন বাঙালী নরপতির উল্লেখ আছে, যথা—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক ঃ ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁর রাজধানী ছিল **কর্ণ সুবর্ণ**। কর্ণ সুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। শশাঙ্কের উপাধি ছিল "নরেন্দ্রাদিত্য"। তিনি সমগ্র পশ্চিমবাংলা জয় করে দক্ষিণ দিকে উড়িষ্যা ও গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। মগধ ও বারাণসী তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরিদিগকে দমন করত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। এই সময়ে কনৌজের সিংহাসনে ছিলেন গ্রহবর্মা মৌখরি। শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মা নিহত ও তাঁর পত্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। রাজ্যশ্রী বন্দিনী হওয়ার সংবাদে তাঁর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন রাজ্যশ্রীর সাহায্যে আসেন। কিন্তু শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকেও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। তিনি প্রথমে ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। পরে কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধ ও তার ফলাফল সম্বন্ধে কোন সঠিক বিবরণ আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

ধর্ম ঃ শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর রাজধানী কর্ণ সুবর্ণ ও রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ছিল। হিউয়েন-সাঙ তাঁর বিবরণীতে শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলে উল্লেখ করেছেন।

কৃতিত্ব ঃ বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তিনি বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাঁর আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

পাল বংশ : শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী বাংলাদেশ জুড়ে চলেছিল বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থা। পাল বংশের প্রতিষ্ঠায় এই দুরবস্থার অবসান ঘটে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা **গোপাল**। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত **গোপাল, ধর্মপাল** ও **দেবপাল**—এই তিনজন পরাক্রান্ত পালরাজার শাসন চলে। দেবপালের পর থেকেই সুযোগ্য নরপতির অভাবে পাল রাজশক্তি দুর্বল হতে শুরু করে।

সেন বংশ : পাল বংশের বেশ কিছুকাল পরে বাংলাদেশে চলে সেন বংশের শাসনকাল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন। বিজয় সেনের পরে **বল্লাল সেন** ও **লক্ষ্মণ সেনের** আমলে সেন রাজাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। সেন রাজাদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে বখতিয়ার খলজী নামে তুর্কী সেনানায়কের অভিযানের ফলে বাংলাদেশে মুসলমান প্রভাব শুরু হয়।

পাল ও সেন রাজত্বে বাংলার সামাজিক জীবনধারা : মুসলমান যুগের আগেই এই দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয়। বিভিন্ন পূজো-পার্বণের সঙ্গে নানা প্রকার আমোদ, উৎসব, নৃত্যগীত, বারমাসে তেরপার্বণ, শ্রদ্ধাদিতে দান, ব্রাহ্মণ ভোজন, প্রায়শ্চিত্তবিধি ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

বাঙালীর জীবন তখন ছিল সুখ-শান্তিতে ভরা। সে সময়কার প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, দুধ, ঘি, মাংস আরও কত কি! তখনকার পরিধেয় ছিল পুরুষদের ধুতি, মেয়েদের শাড়ি। পুরুষেরা গায়ে দিত চাদর, মেয়েরা ওড়না। পুরুষ ও মেয়েরা আংটি ও বলয় এবং গলায় হার পরত; লম্বা চুল রাখত। নৃত্য, গীত, বাদ্য, দাবা-পাশা খেলা ও অভিনয় ছিল বাঙালীর সাধারণ উৎসব। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছিল শিকার, মল্লযুদ্ধ, তীর-ধনুক ও তরবারি খেলা, নৌকা ও অশ্বচালনা ইত্যাদি। বাঙালী তখন জীবনকে সবরকমভাবে উপভোগের চেষ্টা করত। বাঙালী বণিকেরা তখন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, কম্বোজ ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। এই যুগ বাঙালী আর্যাবর্তে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল; শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালীর খ্যাতি সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল; পাল যুগে নির্মিত বিহারের **বিক্রমশীল** ও **উদন্তপুরী** বৌদ্ধবিহারে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা চলত। দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এসব

বৌদ্ধ বিহারে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। অতীশ নামে এক বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য ছিলেন। তিনি বিদ্যবত্তার জন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি পান। পালযুগে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত খ্যাতিলাভ করেন। কমলশীল, রাহুলভদ্র, কল্যাণরক্ষিত, পদ্মসম্ভব প্রমুখও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পালরাজ দেবপালের আমলে সোমপুরী বিহার উল্লেখযোগ্য ছিল।

শিল্প ও ভাস্কর্যে বাঙালীরা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছিল। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পাল রাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধ ও শৈব আচার্যগণ বহু বৌদ্ধ গান ও দোঁহা রচনা করেন। এই সব গান ও দোঁহা **চর্যাপদ** নামে প্রসিদ্ধ। "রামচরিত"-রচয়িতা **সন্ধ্যাকর নন্দী** পাল যুগের একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। সেনরাজা বল্লালসেন **দানসাগর** ও **অদ্ভুতসাগর** নামে দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় **গীতগোবিন্দ**-রচয়িতা **ভক্তকবি জয়দেব** ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। মহাপণ্ডিত **হলায়ুধ** গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাপতি ছিলেন।

ধর্ম : পাল সম্রাটগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁরা উদারতা দেখিয়েছেন। পালযুগে পৌরাণিক ধর্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কৃষ্ণ, শিব ও শক্তি পূজার বহুল প্রচার ছিল। সেনযুগে ধর্মজীবনে উদারতা দেখা গিয়েছিল। সেন রাজারা শিব, বিষ্ণু ও সূর্যের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

(৪) **দক্ষিণ-ভারত :** উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা নদী, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে সাধারণভাবে **দক্ষিণ-ভারত** বলা হয়।

চালুক্য বংশ (বাতাপি) : বাকাটক বংশের পর দাক্ষিণাত্যে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালুক্য বংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। চালুক্যদের দুজন নায়ক **জয়সিংহ** ও **রণরাগ** বাতাপিকে কেন্দ্র করে এই বংশের শক্তি অর্জন করে।

চালুক্য বংশে **প্রথম পুলকেশী** নিজেকে যথার্থ স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ এবং বিজাপুর অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেন। প্রথম পুলকেশীর পুত্র **প্রথম কীর্তিবর্মনও** পিতার মত 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্তমান বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম কীর্তি-বর্মনের মৃত্যুর পর **মঙ্গলেশ** সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু শেষ বয়সে

তাঁকে ভ্রাতুষ্পুত্র **দ্বিতীয় পুলকেশীর** সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এই যুদ্ধে মঙ্গলেশ নিহত হলে দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনে আরোহন করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী কেবল চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন না; তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারত-ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। দিগবিজয়ের দ্বারা তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চালুক্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি '**পরমেশ্বর**' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। গুজরাট ও বিন্ধ্যা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের ফলে দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষ ঘটে এবং এই যুদ্ধে পুলকেশী সাফল্য অর্জন করেন। তিনি পল্লবরাজ **প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের** রাজ্য আক্রমণ করেন। পরবর্তীকালে **নরসিংহ বর্মন** চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন এবং চালুক্য রাজধানী বাতাপিপুর নরসিংহ-বর্মনের অধিকারে আসে। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ দক্ষিণ ভারতে আসেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্য রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই সময় কয়েকজন রাজা চালুক্য সিংহাসনে বসেন। তাঁরা ছিলেন—প্রথম বিক্রমাদিত্য, বিনয়াদিত্য, বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন। দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ তাঁর পর প্রথম কৃষ্ণের আক্রমণের ফলে চালুক্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

চালুক্য যুগে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। জৈন কবি ও সাধু **রবিকীর্তি** এই যুগে খ্যাতি লাভ করেন। চালুক্য স্থাপত্যের বিখ্যাত নিদর্শন হল মেগুটির শিব মন্দির, বিজাপুরের বিরূপাক্ষ মন্দির, বাতাপির বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি।

পল্লব বংশ : খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চী-পুরমকে কেন্দ্র করে পল্লব বংশের উত্থান হয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে এই বংশের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই দুই গৌরবের অধিকারী হলেন দ্বিতীয় সিংহবর্মণের পুত্র **সিংহবিষ্ণু**। সিংহবিষ্ণু মহাবলীপুরমে পল্লব স্থাপত্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহবিষ্ণুর পুত্র **মহেন্দ্রবর্মন** পল্লব বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল এবং এই সংঘর্ষে মহেন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **নরসিংহবর্মন** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পল্লব শক্তিকে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পর পর তিনবার পরাজিত করেন এবং রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন। এজন্য তিনি "**বাতাপিকোণ্ড**" বা বাতাপি বিজেতা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মহামল্লপুরম নগরীকে পাথরের

রথ নির্মাণ করে সুসজ্জিত করেন। নরসিংহবর্মনের পর পল্লব বংশের গৌরব স্তিমিত হতে থাকে। দ্বিতীয় নন্দিবর্মনের রাজত্বকালে পল্লবদিগকে পাণ্ড্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এর পর রাষ্ট্রকূট-রাজ দন্তিদুর্গ কাঞ্চী অধিকার করেন। তবে তিনি নন্দিবর্মনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। দন্তিবর্মনের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট বংশের সাথে পল্লব বংশের সম্পর্কের অবনতি হয় এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কাঞ্চী আক্রমণ করেন।

পল্লব বংশের শেষ রাজা ছিলেন **অপরাজিত বর্মন**। তিনি চোলরাজ প্রথম আদিত্যের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং আদিত্য পল্লব রাজ্য অধিকার করলে ঐ রাজপরিবারের বিলুপ্তি ঘটে।

শিল্প ও স্থাপত্য : প্রাচীন ভারত সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দক্ষিণ ভারতের শিল্প। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পে স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়। ইলোরা ও অজন্তার চৈত্য ও বিহার স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। পল্লব রাজবংশের রাজত্বকালে মহাবলীপুরমের রথাকারে রচিত যুধিষ্ঠির রথ, ভীমরথ ইত্যাদি মন্দির স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছে। কাঞ্চী নগরীতে কৈলাশনাথের মন্দিরটি পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চোলবংশ : দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল তাঞ্জোরের চোলবংশ। বিজয়ালয় নামক চোল রাজার নেতৃত্বে ৮৫০ খ্রীঃ চোলবংশের উন্নতির সূচনা হয়। এরপর আদিত্য, পরান্তক প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করেন। চোলবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম রাজরাজ এবং তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল। চোলগণ অতি প্রাচীন জাতি। চোলরাজ্য নৌবলে বলীয়ান ছিল। এই রাজ্যের বণিকদের বিরাট সংখ্যক বাণিজ্যপোত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যাবতীয় অঞ্চলে ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তারা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত। রাজেন্দ্র চোলদেব বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে পেগু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুমাত্রা, জাভা, মালয়ে চোল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণ ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনদক্ষতা সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৪। হর্ষবর্ধনের বিদ্যানুরাগ ও দানশীলতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ কাহিনী থেকে হর্ষবর্ধনের সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কি কি জানা যায়?

৬। হর্ষের পরবর্তীকালে উত্তর-ভারতের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল ?
৭। কখন ও কিভাবে রাজপুত বংশের উত্থান ঘটেছিল ?
৮। পাল, রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার রাজাদের সংঘর্ষ সম্পর্কে কি জান ?
৯। পাল ও সেন যুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচয় দাও।
১০। চালুক্য রাজাদের সম্পর্কে যা জান লেখ।
১১। পল্লব রাজাদের সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। তোরমান কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?
২। প্রয়াগের ধর্মমহামেলা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৩। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও।
৪। যশোবর্মন সম্পর্কে কি জান ?
৫। শশাঙ্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও।
৬। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। **ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ**

(ক) হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রভাকরবর্ধন। (খ) গুপ্ত রাজাদের আমলে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ ভারতে আসেন। (গ) গুপ্তরাজ বালাদিত্য হূণদের হাতে পরাজিত হন। (ঘ) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের নিকট পরাজিত হন। (ঙ) রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম নাগভট্ট।

২। **সঠিক উত্তরটি (√) চিহ্নিত করে দেখাও ঃ**

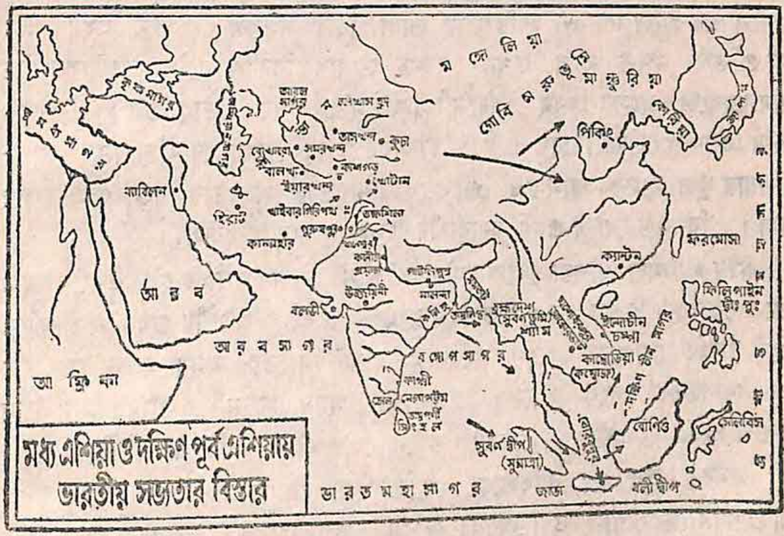
(ক) ভারতে হূণদের প্রথম নায়ক ছিল—	(ক) এটিলা/তোরমান/মিহিরগুল
(খ) হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন—	(খ) হিউয়েন-সাঙ/শীলভদ্র/বাণভট্ট
(গ) পুষ্যভূতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—	(গ) রাজ্যবর্ধন/হর্ষবর্ধন/প্রভাকরবর্ধন
(ঘ) হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের রাজা—	(ঘ) ধর্মপাল/দেবপাল/শশাঙ্ক

৩। **মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ**

(ক) শ্বেতহূণ কাদের বলা হত ? (খ) শাকল কার রাজধানী ছিল ? (গ) রাজ্যশ্রী কে ছিলেন ? (ঘ) হূণদের প্রতিরোধে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এমন দুইজন রাজার নাম কর। (ঙ) হর্ষচরিত বইটি কার লেখা ? (চ) শীলভদ্র কে ছিলেন ? (ছ) গীতগোবিন্দ বইটি কার লেখা ? (জ) সন্ধ্যাকর নন্দী কে ছিলেন ? (ঝ) হিউয়েন-সাঙের গুরু কে ছিলেন ? (ঞ) ধীমান ও বীটপাল কে ছিলেন ? (ট) চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? (ঠ) দক্ষিণ ভারতের দুইটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তির উল্লেখ কর।

১২ | মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারত এবং পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে স্থলপথে ও জলপথে এই সব দেশের বাণিজ্য চলত, পণ্যের আদান-প্রদান হত। স্থলপথে একদিকে পারস্য, ব্যাবিলন, সিরিয়া ও মিশর এবং অন্যদিকে আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া ও চীন পর্যন্ত হিন্দু বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত। এই সকল দেশ থেকেও বণিকরা তাদের পণ্য বিক্রয় করতে ভারতে আসত। আবার পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের বহু বন্দর থেকে সমুদ্রপথে মিশর পর্যন্ত পণ্য চালান যেত এবং সেখান থেকে নানা প্রকার পণ্য রোমের বাজারে পাঠান হত। পূর্ব-



মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

ভারতের বঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, তামিল প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতীয় বণিকরা জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত।

কালক্রমে ভারতের অধিবাসীরা মধ্য এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহে বহু উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও রাজ্য গড়ে তুলেছে। এর ফলে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিল্প এই সকল অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছে। চীন থেকে পারস্য এবং সাইবেরিয়া থেকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি

দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। আজও এই সকল জায়গায় অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে।

ভারত ও মধ্য-এশিয়া ঃ মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান ও কাশগড় প্রভৃতি স্থানে এককালে ভারতীয় সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ **স্যার অরেলস্টাইন** এই সকল অঞ্চলের বালুকা স্তূপ খনন করে মাটির নীচ থেকে বহু বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু মন্দির এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে আবিষ্কার করেছেন। অশোকের সময় থেকে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট কণিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছিল। এই সময় থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম কাস্পিয়ান সাগর থেকে চীন, কোরিয়া, জাপান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। খোটানে বহুকাল ভারতীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন। এখানে এককালে ধর্ম ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন প্রাকৃত ভাষার বিকাশ ঘটে। হিউয়েন-সাঙ যখন ভারতে আসেন তখন খোটানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। সেখানে তিনি একশত বৌদ্ধ বিহার ও পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেছিলেন। মধ্য-এশিয়ার কুচা নামক স্থানটিও এককালে ভারতীয় সভ্যতার বড় একটি কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ **কুমারজীব** ছিলেন কুচার অধিবাসী।

চীন ঃ মধ্য-এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে প্রচারিত হয় এবং সেখান থেকে কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট মিংতি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট মিংতির সময় দুজন ভারতীয় শ্রমণ ভারতবর্ষ থেকে চীনের রাজসভায় গমন করেন। তাঁদের নাম ছিল **কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন**। তারপর চীনে বৌদ্ধমঠ ও বিহার নির্মিত হয়। এই সময় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়। চীনের বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সন্ন্যাস ও ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করেন। এরপর চীন দেশ থেকে দলে দলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে আসেন। তাঁরা সংস্কৃত ও পালিভাষা শিখে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে দেশে ফিরে যান। দেশে ফেরার পথে তাঁরা বৌদ্ধ গ্রন্থ ও মূর্তি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। এই সকল গ্রন্থ অনুবাদ করে তাঁরা তাঁদের দেশে প্রচলন করেন। এভাবে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার ফলে ঐ সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

তিব্বত ঃ সপ্তম শতাব্দীতে **স্রং-সান-গামপো** নামে একজন শক্তিশালী

রাজা তিব্বতে রাজত্ব করতেন। তাঁর সময় বৌদ্ধধর্ম প্রথমে তিব্বতে প্রচারিত হয়। তিনি খোটান থেকে ভারতীয় লিপি গ্রহণ করে তাঁর নিজের দেশে প্রচলন করেন। সেই সময় থেকে বহু তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতে নালন্দা ও বিক্রমশীলার মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার জন্য আগমন করেন। ভারতীয় পন্ডিতরাও অনেকে তিব্বতে যান এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুবাদে তিব্বতীয় পণ্ডিতদের সহায়তা করেন। বাংলায় পাল রাজবংশের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সম্রাট **নয়পালের** রাজত্বকালে বিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত **অতীশ দীপঙ্কর** তিব্বতে যান এবং তের বছর সেখানে থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কার করেন। তিনি বহু বৌদ্ধ পুঁথি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁকে তিব্বতীয়রা গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। তিব্বতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তিব্বতের সম্পাগুলিতে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আছে। তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের লামা বলা হয়। তিব্বতের ধর্মগুরুর নাম দালাই-লামা। বহু পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে তঞ্জুর ও কঞ্জুর এখনও আছে।

সিংহল: রামায়ণের **লঙ্কা** বর্তমানের সিংহল বা শ্রীলঙ্কা। সিংহলের রাজা **তিস্যের** অনুরোধে অশোক তাঁর পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র, পৌত্রী সুমন এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে (মতান্তরে ভগিনী) সিংহলে প্রেরণ করেন। দক্ষিণ ভারতের বহু তামিল এই দেশে বাস করে। চোল রাজাদের আমলে সিংহলে ভারতীয় শাসন কিছুদিনের জন্য স্থাপিত হয়। সমগ্র সিংহল কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম, পালি ভাষা ও ভারতীয় লিপি গ্রহণ করেছিল।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি: ভারতের পূর্ব সীমান্ত ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সহজে প্রবেশ করেছিল। ব্রহ্মদেশ নামটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। সপ্তম শতকে অন্ধ্রদেশ থেকে বহু তেলেগুভাষী লোক দক্ষিণ ব্রহ্মে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৃতীয় খ্রীঃ, দক্ষিণ ব্রহ্মে শ্রীক্ষেত্র নামে হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পাল বংশের সাথে ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশ হিন্দুদের কাছে **সুবর্ণভূমি** বলে পরিচিত ছিল। অতি প্রাচীন কালেই ভারতবাসী এই সকল দেশে বাণিজ্য করতে যেত। বাণিজ্যের উপলক্ষ্যে কালক্রমে এই সকল দেশে ভারতীয়রা উপনিবেশ বিস্তার ও রাজ্য স্থাপন করে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে কয়েক শত বৎসর ধরে এখানে বহু হিন্দু রাজ্য গড়ে ওঠে এবং দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ায় ভারতের সভ্যতা ও ধর্ম বিস্তার লাভ করে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা এবং শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ইন্দোচীন চম্পা ঃ বর্তমান ইন্দোচীনে প্রাচীনকালে চম্পা (বর্তমান আনাম) ও কম্বোজ (বর্তমান কম্বোডিয়া) নামে দুটি প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠেছিল। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় তেরশত বৎসর পর্যন্ত এখানে বর্মন উপাধিধারী হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। চম্পারাজ্যের বহু নগরে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। ইন্দ্রপুর ও বিজয় চম্পার বড় দুটি নগর ছিল। এখানে সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল আক্রমণে চম্পারাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

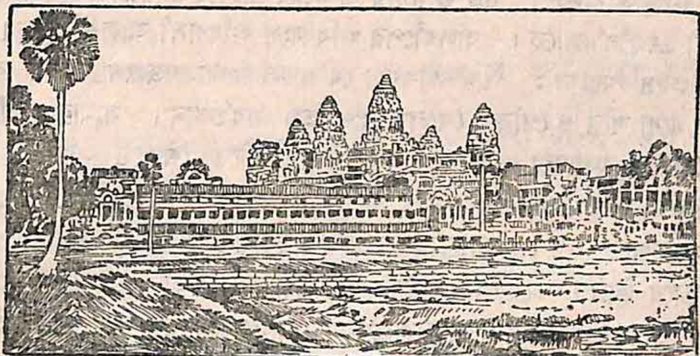
কম্বোজ ঃ খ্রীস্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোজে একটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাদ আছে **কৌণ্ডিণ্য** নামে এক ব্রাহ্মণ কম্বোজ রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যকে চীনারা বলত **ফু-নান**। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করত; কম্বোজের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। একসময়ে বর্তমানে কম্বোডিয়া, কোচিন, লাওস, শ্যাম, মালয় ও ব্রহ্মদেশের অনেকাংশ কম্বোজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নবম শতাব্দীতে **রাজা সপ্তম জয় বর্মণ** যশোধরপুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এর বর্তমান নাম **আঙ্কোরথোম**। তখনকার সময়ে দেশ-বিদেশে এই নগরের খ্যাতি ছিল। নাগরিকদের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষের বেশি। নগরের চারিদিকে ছিল উঁচু প্রাচীর, প্রাচীরের পরে ছিল পরিখা। পরিখাটি পার হওয়ার জন্য একটি সেতুর ব্যবস্থা ছিল।

নগরের অভ্যন্তরে ছিল সুন্দর সুন্দর মন্দির, হাসপাতাল এবং বড় বড় দীঘি। দীঘিগুলিতে অসংখ্য নৌকা থাকত। রাজধানী আঙ্কোরথোমের মাঝখানে ছিল **বেয়নমন্দির**; মন্দিরটি রথের আকারে তিন স্তরে নির্মিত। বর্তমানে মন্দিরের চূড়াগুলি মাটিতে পড়ে গিয়েছে এবং চারিদিকের প্রাচীর ও স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়েছে। বেয়নমন্দিরে কোন প্রাচীন লিপি পাওয়া যায়নি; তাই এখানে কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে বেয়নমন্দিরের প্রস্তর প্রাচীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্র অঙ্কিত আছে। সেখানকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার পরিচয়ও মন্দিরের চিত্রগুলিতে পাওয়া যায়।

কম্বোজ সভ্যতার আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি **আঙ্কোরভাটের** বিখ্যাত **বিষ্ণু মন্দির**। পাথরে গড়া এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দির। কয়েকটি থাকবিশিষ্ট

বিরাট একটি মঞ্চের ওপরে প্রধান মন্দিরটি স্থাপিত রয়েছে। বুরুজের আকারে গঠিত সাত ফুট উঁচু মন্দির চূড়াটি আকাশ ভেদ করে উঠেছে। মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক কাহিনী অঙ্কিত আছে। প্রায় পৌনে দু মাইল বিস্তৃত এই মন্দিরটি প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল।



আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির

পরিখাটি প্রস্থে সাতশ ফুট ছিল। বিশালতায় ও অনুপম ভাস্কর্যে আঙ্কোরভাটের মন্দিরটি জগতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের মধ্যে একটি। চম্পার মত কম্বোজ রাজ্যও ছিল সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্যের একটি বড় কেন্দ্র। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই রাজ্যের পতন ঘটে।

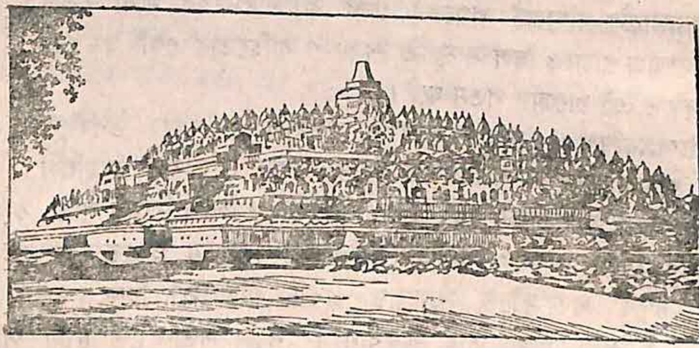
ইন্দোনেশিয়া : সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপেও খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব স্থানেও ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও লিপি বিস্তার লাভ করেছিল। এই সব দেশে এখনও ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন ও প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রায় একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। **শ্রীবিজয়** ছিল তার রাজধানী। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক **ইং-সিং** এখান থেকে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। তখন এই অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে পরবর্তী প্রায় পনের শ' বছর পর্যন্ত যবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা যবদ্বীপের অধিকাংশ স্থান জয় করেছিলেন। পূর্ব-যবদ্বীপের রাজাদের সাথে তাঁদের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের ফলে যবদ্বীপের হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই বিকাশ লাভ করেছিল।

বলিদ্বীপেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। এটি প্রথমে যবদ্বীপের অংশ ছিল পরে স্বাধীন হয়ে যায়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন হয়েছিল। পরে হিন্দু ধর্ম আবার প্রাধান্য লাভ করে। সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, বোর্নিও, মালয় প্রভৃতি দেশে হিন্দু সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। এই জায়গার মন্দিরের প্রাচীরে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। বলিদ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী আজও হিন্দু।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য : পূর্ব-এশিয়ায় যে সকল হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করেছে তাদের মধ্যে শক্তি ও গৌরবে শৈলেন্দ্র বংশ ছিল সর্বপ্রধান। সুমাত্রার **শ্রীবিজয়** ছিল শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজধানী। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য মালয় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করে। বাণিজ্য দ্বারা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রচুর অর্থলাভ হত। আরবীয় লেখকেরা শৈলেন্দ্র রাজাদের ধনসম্পদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শৈলেন্দ্র রাজাদের একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের রাজারা শৈলেন্দ্র রাজগণকে ভয় করতেন। তাঁদের মধ্যে দূত বিনিময় চলত।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করান। সেগুলির মধ্যে যবদ্বীপের **বরোবুদুর** মন্দিরটি খুবই প্রসিদ্ধ। মন্দিরটি পাহাড়ের



বরোবুদুরের মন্দির

উপরে স্থাপিত এবং পর পর নয়টি স্তরে ঘণ্টাকৃতি একটি স্তূপ আছে। এই মন্দিরের শিল্পকার্য এবং বৌদ্ধ জাতকের চিত্রাবলী দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। বিশালতা ও ভাস্কর্যে বরোবুদুরের মন্দির সে যুগের হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা **মহাযান বৌদ্ধধর্ম** গ্রহণ করেন। তখনকার সময়ে ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল **বঙ্গদেশ**। **বালপুত্রদেব** নামে শৈলেন্দ্র বংশের এক রাজা নালন্দার বৌদ্ধ বিহারের একটি মঠ নির্মাণ

করান। এই মঠের ব্যয় বহন করার জন্য বঙ্গদেশের রাজা **দেবপাল** পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। **কুমার ঘোষ** নামে একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। অতীতকালের ভারতবর্ষের সঙ্গে কিভাবে অন্য দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

২। ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা কর।

৪। ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল?

৫। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। তিব্বতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২। ভারত থেকে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফল কি হয়েছিল? ৩। বরোবুদুর, বেয়নমন্দির, যশোধরাপুর—এদের সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। বাম পাশের প্রশ্নগুলির সাথে ডান পাশের উত্তরগুলি সঙ্গতি করে বসাও ঃ

(ক) তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান……	(ক) কাশ্যপ মাতঙ্গ
(খ) চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন……	(খ) অতীশ দীপঙ্কর
(গ) কম্বোজ রাজ্য স্থাপন করেন……	(গ) চম্পা
(ঘ) বর্তমান ইন্দোচীনের প্রাচীন কালের নাম ছিল……	(ঘ) কৌণ্ডিণ্য।

২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরেলস্টাইনের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। (খ) বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ কুমারজীব ছিলেন সিংহলের অধিবাসী। (গ) সেন বংশের সাথে ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ ছিল। (ঘ) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কম্বোজে একটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (ঙ) কম্বোজ সভ্যতার আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি বরোবুদুরের মন্দির।

৩। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) স্থলপথে ভারতীয় বণিকেরা কোন্ কোন্ দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন? (খ) খোটান কোথায় ছিল? (গ) চীনে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান? (ঘ) স্রং-সান-গামপো কে ছিলেন? (ঙ) সুবর্ণ ভূমি বলতে কোন্ অঞ্চলকে বোঝাত? (চ) সিংহলে কে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান? (ছ) যশোধরাপুর কোন্ রাজাদের রাজধানী ছিল? (জ) ইন্দোচীনকে প্রাচীনকালে কি বলা হত? (ঝ) শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল?

১৩ | ভারতের তুর্কী-আফগান সুলতানদের শাসনকাল

ইসলামধর্মী আরবেরা শৌর্য ও পরাক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। বিভিন্ন খলিফার আমলে ইসলামধর্মী আরবদের দেশ-বিদেশে বিজয় অভিযানের কাহিনী আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাঠ করেছি। **হারুন-অল-রসিদ** যে বংশের খলিফা ছিলেন সেই আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে কেমন করে বাগদাদ নগরী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরীতে পরিণত হয়েছিল—তার কথাও সহজে ভুলে যাওয়া যায় না। আব্বাসীয় বংশের খলিফারা কালক্রমে উপযুক্ত রণকুশলী ও শাসনপটু শাসকের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিরাট আরব সাম্রাজ্যের অধীন ছোট-ছোট শাসকেরা তখন কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলির মধ্যে **আলপ্তগীন** প্রতিষ্ঠিত **গজনী** রাজ্য, তুর্কীবীর সালাদিনের বংশধরদের **খাওয়ারিজম** এবং **ঘুর** বংশীয়দের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



সুলতান মামুদ

ভারতে তুর্কী-আফগানদের আগমন ও ইসলামের বিস্তার : অষ্টম শতকে সিন্ধু-দেশের রাজা দাহিরের সঙ্গে ইরাকের শাসনকর্তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। তখন মহম্মদ-বিন-কাশিম নামে একজন সেনাপতি দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। দাহির অবিরাম যুদ্ধ করেও রাজ্যের শত্রুর হাতে নিহত হন। দশম শতকে আলপ্তগীন আফগানিস্তানে এক স্বাধীন গজনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই গজনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **সুলতান মামুদ**। দশম শতকের শেষ ভাগ থেকে একাদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত তিনি সতেরো বার ভারতে অভিযান চালান। প্রতিবারই তিনি এ দেশ থেকে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর আক্রমণে বিখ্যাত **সোমনাথের মন্দির** ধ্বংস হয়। **মহম্মদ-বিন-কাশিম** কিংবা সুলতান মামুদ—এঁরা কেউই ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেননি।

ভারতে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য স্থাপনের কৃতিত্ব ঘুরবংশীয় সুলতানদেরই প্রাপ্য। এই বংশের সুলতান শিহাবুদ্দিন সে যুগের পরাক্রান্ত রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। পৃথ্বীরাজের শ্বশুর কনৌজরাজ জয়চন্দ্রও তাঁকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় আত্মহত্যা করেন। এই শিহাবুদ্দিন ইতিহাসে **মহম্মদ ঘুরী** নামে পরিচিত। ১১৯১ ও ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর নিকট তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হয়। প্রথমে পৃথ্বীরাজ জয়ী হলেও দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন। মহম্মদ ঘুরী গজনীর সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে সে রাজ্যটি জয় করেন। কুতব-উদ্দিন আইবক নামে তাঁর একজন সেনাপতি দিল্লী জয় করেছিলেন।



মহম্মদ ঘুরী

আর একজন সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন বখতিয়ার খলজী বাংলা ও বিহারে বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন। এমনি করে উত্তর ভারতে ঘুর সুলতানের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। মহম্মদ ঘুরী এর পর স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

দাস বংশ ঃ মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম সেনাপতি **কুতব-উদ্দিন আইবক** (১২০৬ খ্রীস্টাব্দে) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সমগ্র ভারতে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি দাস বংশ নামে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কুতব-উদ্দিনের নাম মধ্যযুগের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কুতবের পর দিল্লীর সিংহাসনে যাঁরা আরোহণ করেছিলেন প্রথম জীবনে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ক্রীতদাস। সেজন্য এই বংশের নাম হয় **দাস বংশ**। কুতব-উদ্দিন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত **কুতব-মিনারের** নির্মাণ কার্য শুরু হয়।

দাস বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **ইলতুৎমিস**। প্রথম জীবনে তিনি কুতব-উদ্দিনের দাসরূপে জীবন শুরু করেন। পরে তিনি তাঁর কর্মদক্ষতায় কুতবের প্রিয়পাত্র হন ও কুতবের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইলতুৎমিস ছিলেন একজন পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য বিজেতা ও সুদক্ষ শাসনকর্তা। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দূরদর্শিতায় ভারতবর্ষ

দুর্ধর্ষ মোঙ্গলবীর চিঙ্গিজ খাঁর আক্রমণের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পায়। বিদ্যানুরাগী ও শিল্পরসিক সুলতানরূপে ইলতুৎমিসের খ্যাতি ছিল।

ইলতুৎমিসের পরবর্তী দাস সুলতানদের মধ্যে **সুলতানা রিজিয়া** ও **গিয়াসউদ্দিন বলবনের** নাম উল্লেখযোগ্য। ইলতুৎমিসের উত্তরাধিকারিণী ও সুযোগ্যা কন্যা রিজিয়া ছিলেন সুলতানী আমলের একমাত্র মহিলা শাসক। তাঁর সাহস, বীরত্ব, রণদক্ষতা এবং শাসনক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শত্রুদের চক্রান্তে অল্পকাল রাজত্ব করার পরেই প্রাণ হারান।



সুলতানা রিজিয়া



ধর্মপ্রাণ নাসিরুদ্দিন

সুলতানা রিজিয়ার পরে দাস সুলতানদের মধ্যে ধর্মপ্রাণ **নাসিরুদ্দিনের** শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। তিনি ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ছিলেন। তিনি দীন-দরিদ্রের মত জীবন-যাপন করতেন। দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর ছিল অসীম করুণা ও সহানুভূতি। খুব কম বয়সে এই ধর্মপ্রাণ সুলতানের মৃত্যু হয়।

গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন ইলতুৎমিসের পুত্র ধর্মপ্রাণ নাসিরুদ্দিনের শ্বশুর। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য দাসরূপে জীবন শুরু করেছিলেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পরে গিয়াসুদ্দিন দিল্লীর সুলতান হন। তাঁর দৃঢ়তা ও শাসনদক্ষতায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি চেষ্টা করেন। সাহিত্যানুরাগী ও শিল্প রসিক সুলতানরূপে মধ্যযুগের ইতিহাসে গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন খ্যাতিমান।

খলজি বংশ : দাস বংশের পতনের পরে শুরু হয় খলজি বংশের শাসনকাল। খলজি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন **আলাউদ্দিন খলজি**। তিনি ছিলেন

একজন দিগ্বিজয়ী বীর। উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে পূর্বে আসামের সীমা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরের সাহায্যে সর্বপ্রথম দক্ষিণে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকালে মোঙ্গলেরা বার বার ভারতে অভিযান চালায়। জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আলাউদ্দিনের একটি উল্লেখ-যোগ্য শাসন সংস্কার। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন।



আলাউদ্দিন খলজি

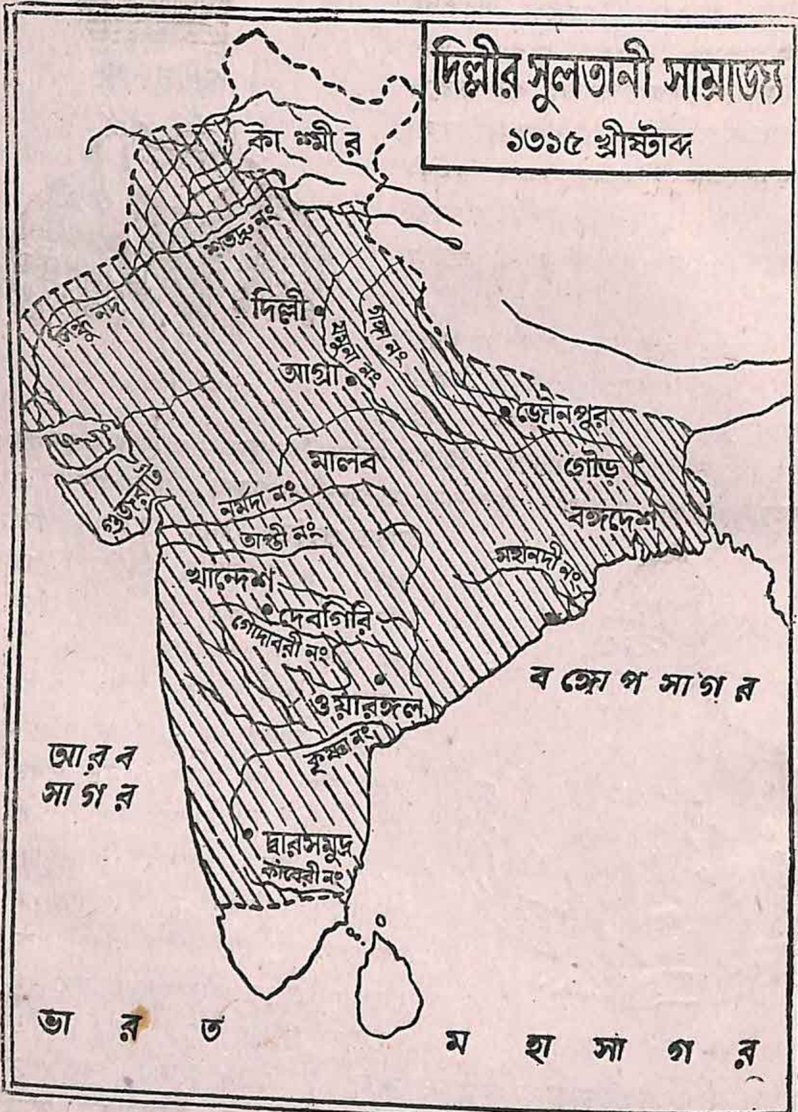
তুঘলক বংশঃ খলজি বংশীয়রা দুর্বল হলে তুঘলক বংশীয়রা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের দুজন খ্যাতনামা সুলতান ছিলেন **মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক।** তুঘলক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক দোষে-গুণে এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনার উদ্ভাবন করে-ছিলেন। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির অভাবে সেগুলির অধিকাংশই ব্যর্থ হয়। চীন-দেশের অনুকরণে তামার মুদ্রা প্রবর্তন করে তিনি রাজভাণ্ডার শূন্য করে ফেলেন। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তনের পরিকল্পনার ফলস্বরূপ অনেক লোকের প্রাণহানি হয়। খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা বহু অর্থ ও সৈন্য হানির কারণ ঘটে। তিনি দোয়াব অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব বাড়ান, ফলে বহু প্রজা অশেষ কষ্ট পায়। এমনিভাবে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে দেশে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলক এই দুরবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি বহু প্রাসাদ, হাসপাতাল, মসজিদ,



মহম্মদ-বিন-তুঘলক

সরাইখানা নির্মাণ করান। কৃষির উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান : ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরে তুঘলক



বংশের কয়েকজন অক্ষম সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই বংশের শেষ সুলতান মামুদ শাহের শাসনকালে সমরখন্দের দুর্ধর্ষ চাঘতাই বীর তৈমুরলঙ্গ ভারতে অভিযান চালান। একটানা পাঁচদিন ধরে লুণ্ঠন চলে।

হিন্দু-মুসলমান, নারী-শিশু নির্বিশেষে বহু লোক প্রাণ হারায়। তৈমুরের অভিযানের পর তুঘলক বংশের পতন ঘটে। তারপর সৈয়দ ও লোদী বংশীয়রা একশ বছরের কিছু সময় পর্যন্ত শাসন করেন। ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে তৈমুর বংশের পরাক্রান্ত বীর **বাবর** ভারতে অভিযান চালান। দিল্লীর কাছে **পানিপথের যুদ্ধে** (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন ও সুলতানী শাসনের অবসান ঘটান।

সুলতানী আমলের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন: সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বজায় ছিল। সকলের ওপরে ছিলেন সুলতান। তাঁর অধীনে ছিল কিছু সংখ্যক প্রাদেশিক শাসক। তাঁরা ছিলেন ক্ষমতাবান। প্রাদেশিক শাসকেরা কার্যতঃ স্বাধীনভাবে শাসন চালাতেন। তাঁরা নামেমাত্র কেন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাতেন।

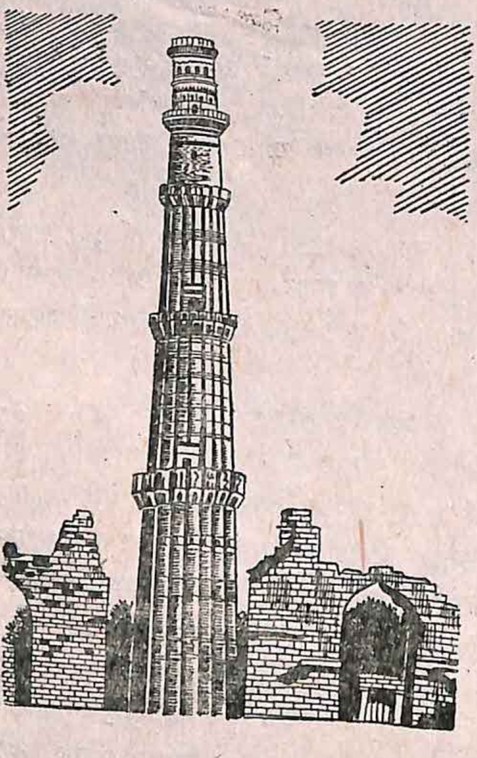
সমাজে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল। চাষী, কুমোর, কামার, ছুতোর, কারিগর ইত্যাদি পেশায় অসংখ্য লোক নিযুক্ত থাকত। এছাড়া ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলনও ছিল। সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। আমীর-ওমরাহরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। তবে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা সমাজে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পেতেন।

পূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ বলিদানের প্রথা ছিল। হোলি, বৈশাখী প্রভৃতি সামাজিক আমোদ-উৎসব হিন্দু-মুসলমানগণ এক সঙ্গেই করতেন। নৃত্য, সঙ্গীত, ক্রীড়া, শিকার, গ্রাম্য মেলা প্রভৃতি উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের স্থল ছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে কৃষিই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান—দুটি সম্প্রদায়ের লোকই চাষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সুলতানকে পাঠাত। সুলতানরা তাঁদের খুশিমত খাজনা নির্ধারণ করতেন। সমাজে ধনী আমীর-ওমরাহরা বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের মূল্য খুশিমত নির্ধারণ করত। কখনও কখনও ওজনে কমও দিত। তখন দেশ প্রচুর সম্পদশালী ছিল। সুলতান ও আমীর-ওমরাহরাই সে সব ভোগ করতে পারত। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় প্রজাদের কাছ থেকে শাসকেরা ইচ্ছেমত খাজনা আদায় করত। গরীবদের শোষণ করে সুলতান ও অভিজাত শ্রেণীর অর্থ ও ঐশ্বর্য সাধিত হত। সে যুগে প্রধান শিল্প ছিল তুলার বস্ত্রবয়ন। দেশের জীবনযাত্রা সতেজ ও সবল ছিল। হিন্দুদের

আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। হিন্দুগণকে জিজিয়াকর ও তীর্থকর দিতে হত।

হিন্দু-মুসলিম ধর্মসমন্বয়ঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বিপরীত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিরোধ চলেছিল; দীর্ঘকাল এই দুই ধর্মাবলম্বী পাশাপাশি বাস করার ফলে বিরোধ ও ব্যবধান দূর হয়ে মিলনের ভাব দেখা দেয়। হিন্দুদের অনেক ধর্মীয় আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে গৃহীত হয়। আবার মুসলমানদের অনেক ধর্মীয় রীতি-নীতি হিন্দুরা গ্রহণ করে। হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরা ওলাবিবি, শীতলা, মনসা, গঙ্গা পূজা শুরু করে। হিন্দুরাও মুসলমানদের প্রভাবে পীরদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা আরম্ভ করে। যেমন, সত্যনারায়ণ, ত্রৈলোক্য, পাঁচ পীর ইত্যাদি। হিন্দুরা মুসলমানদের পীরের দরগায়ও সিন্নি দিতে আরম্ভ করে। এভাবে দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার কিছুটা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।



দিল্লীর কুতবমিনার

শিল্প ও স্থাপত্যঃ হিন্দু-মুসলিম ধর্মসমন্বয়ের প্রভাব সুলতানী আমলের শিল্প ও স্থাপত্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মুসলমান সুলতানেরা শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ ও সমাধি নির্মাণ করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এযুগের শিল্পরীতিতে হিন্দু ও মুসলমানরীতির সংমিশ্রণের ফলে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য এসেছে। দিল্লীর কুতবমিনার, আলাই দরওয়াজা, ফিরোজ শাহের প্রাসাদ ও তুঘলকাবাদের হর্ম্যমালা সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃত্ব নির্মিত জমায়াৎখানা

মসজিদ এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা এযুগের উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি। জৌনপুরের অধিকাংশ মসজিদই হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত করে নির্মাণ করা হয়। অটলা মসজিদ জৌনপুরী স্থাপত্য রীতির চমৎকার উদাহরণ।

অনুবাদ সাহিত্যের সমৃদ্ধি : সুলতানেরা শিল্প ও স্থাপত্যের মত সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় এ যুগের কবিরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হন। বহু সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী গ্রন্থ এ সময়ে প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়। সেগুলির মধ্যে হিন্দীতে **তুলসীদাসের রামায়ণ, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার কুলিন গ্রামের মালাধর বসু হুসেন শাহের উৎসাহে ভাগবৎ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য লিখে গুণবার খান উপাধি লাভ করেন। পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। এযুগে লৌকিক ভাষারও বিকাশ ঘটে। এযুগে রচিত কবীরের দোঁহা, তুকারাম ও নামদেবের রচনাবলী, খসরুর হিন্দী ও উর্দু কবিতা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সমতুল্য। এযুগে কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থও লেখা হয়। সেগুলির মধ্যে আমীর খসরুর **তারিখ-ই-আলাই,** সিরাজের **তবকাত-ই-নাসিরী,** জিয়াউদ্দিন বরনীর **তারিখ-ই-ফিরোজশাহী** এযুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ।

ভক্তি আন্দোলনের বিকাশ ও কয়েকজন সাধু-সন্ত : হিন্দু ও মুসলমান— এই দুই ধর্মের সমন্বয়সাধনের মূলে সে যুগের কয়েকজন ধর্মসাধক বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। হিন্দুরা যাকে বলে ভগবান, মুসলমানদের কাছে তিনিই আল্লা। জাতি ও ধর্মের সংকীর্ণতা এবং অন্ধ কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরে অবিচল আস্থা রাখাই হল ভক্তি। এই ভক্তির ভাবধারা এ যুগের কয়েকজন সাধু-সন্তের প্রভাবে ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। একে বলা হয় **ভক্তি আন্দোলন।** আমরা এখানে এ যুগের কয়েকজন মিলনপন্থী মহাপুরুষের জীবনকথা জানবার চেষ্টা করব।



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য : পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন। জীবে দয়া ও ভগবানে প্রেমই ছিল তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। তাঁর শিষ্য যবন হরিদাস ছিলেন মুসলমান।

নানক : পাঞ্জাবে গুরু নানক শিখধর্ম প্রচার করেন। তিনি জাতিতে

কলু বা কালোয়ার ছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তিনি একেশ্বরবাদের আদর্শ প্রচার করতেন। তিনি সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি প্রচার করেছিলেন। নাম, দান, স্নান ছিল নানকের উপদেশ। তাঁর মতে ঈশ্বর প্রেমই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। হিন্দু-মুসলিম ধর্মসমন্বয় করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। গুরু নানকের উপদেশাবলী সংকলিত করে একখানি পুস্তক রচিত হয়েছে। এ পুস্তকের নাম "গ্রন্থসাহেব"।



নানক



কবীর

কবীর ঃ কবীর জাতিতে ছিলেন মুসলমান জোলা। তিনি দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত ধর্মসাধক গুরু রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি বলতেন, হিন্দুর পরমেশ্বর এবং মুসলমানের আল্লা এক। কবীর মুখে মুখে গান গেয়ে উপদেশ দিতেন। সেগুলিকে বলে **কবীরের দোঁহা**। এই দোঁহা হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি মানসিক পবিত্রতা ও আন্তরিকতার জোর দিতেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের আদর্শ ছিল আত্মশুদ্ধি ও ভক্তি। তিনি মনে করেন হিন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত দুটি পাত্র বিশেষ।

সুলতানী আমলে বাংলা দেশ ঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক জুড়ে বাংলা দেশে মুসলমানী অভিযান চলেছিল। চতুর্দশ শতকে **ইলিয়াস শাহ** বংশীয়দের রাজত্বের সূচনায় সাময়িক কালের জন্য বাংলা দেশে শৃংখলা দেখা দেয় ও সুলতানী শাসনের সূচনা হয়। কিন্তু সুলতানদের মধ্যে অন্তর্কলহ, যুদ্ধ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এই বংশের পতন হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে **হুসেন শাহ** কর্তৃক হুসেন শাহ বংশের প্রতিষ্ঠায় বাংলা দেশে শান্তি ও শৃংখলা দেখা দেয়। নানা দিক থেকে বাংলা ও বাঙালীর সমৃদ্ধি ঘটে। হুসেন শাহের সুযোগ্য পুত্র নসরৎ শাহ এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ থেকে যোড়শ শতকের মধ্য ভাগ

পর্যন্ত বাংলা দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা এখানে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

সামাজিক জীবন ঃ সুলতানী আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁর নীচে ছিলেন অভিজাত শ্রেণীভুক্ত আমীর-ওমরাহরা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে সাধারণ রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের বোঝাত। সমাজে সকলের নীচে ছিল কৃষক ও শ্রমিক। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে নারীর অধিকার সংকুচিত হয়। সুলতানেরা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন।

সাংস্কৃতিক জীবন ঃ সুলতানী আমলে বাংলা দেশে আরবী ও ফারসী ভাষার ব্যাপক চর্চা চলত। টোলে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। এ যুগে শিল্প ও স্থাপত্যের অগ্রগতি দেখা দেয়। **ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ, একলাখী প্রাসাদ** ইত্যাদি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি। হিন্দু-মুসলিম ধর্মসমন্বয়ের প্রভাবে হুসেন শাহের আমলে বাংলা দেশে সত্যপীরের পূজার ব্যাপক প্রচলন হয়।

সাহিত্যের অগ্রগতির দিক থেকে সুলতানী আমলের অবদান অসামান্য। সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের আনুকূল্য ও উৎসাহে এ সময়েই **কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত,** মালাধর বসুর **ভাগবতের অনুবাদ,** চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির **বৈষ্ণবপদাবলী,** মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর **চণ্ডীমঙ্গল** ইত্যাদি রচিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ সুলতানী আমলে কৃষি ও শ্রমশিল্প ছিল প্রধান জীবিকা। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য করেও বহুলোক জীবিকা চালাত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি। কর ও রাজস্ব ভিন্ন নানা প্রকার অতিরিক্ত করের ফলে জনসাধারণের অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিল না। তখন বাংলাদেশে রেশম ও পশমের বস্ত্র তৈরী হত এবং বিদেশে রপ্তানী হত।

সুলতানী আমলের শাসনব্যবস্থা ঃ শাসনব্যবস্থার নামে সুলতানগণ প্রকৃত পক্ষে এক কর্তৃত্ব রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। একাধারে সম্রাট, সেনাধ্যক্ষ ও বিচারপতিরূপে সুলতানই ছিলেন শাসনব্যবস্থার মূলাধার। তাঁর কথাই ছিল দেশের আইন। মন্ত্রী, অমাত্য, প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই ছিলেন সুলতানের ভৃত্যস্বরূপ। তাঁদের অধীনে ছিল কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী। যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী সুলতানেরা দায়িত্ব বণ্টন করে দিতেন। কোন কোন সুলতান যোগ্যতা-সম্পন্ন হিন্দুকেও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। রাজকর্মচারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদমর্যাদা নির্ধারিত হত। শাসকদের

মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। তাঁরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজাকে সমান চোখে দেখতেন। আবার ধর্মীয় অনুদারতার পরিচয় দিয়ে হিন্দু প্রজাদের উপর নানাপ্রকার ধর্মীয় শাসন ও করের বোঝা চাপিয়ে দিতেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে ঘুর ও গজনীর সুলতানদের অভিযান সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

২। দাসবংশের সুলতানদের রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। খলজি ও তুঘলক বংশীয় সুলতানদের শাসনকাল সম্পর্কে পরিচয় দাও।

৪। সুলতানী আমলে ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা কিরূপ ছিল ?

৫। মধ্যযুগে ধর্মসমন্বয় ও ভক্তি আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। সুলতানী আমলে বাংলা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা কিরূপ ছিল ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান কে ? তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে কি জান ?

২। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে কি জান ?

৩। চৈতন্য, কবীর, নানক—এঁদের পরিচয় দাও।

৪। সুলতানী আমলে বাংলা দেশের শাসনব্যবস্থা কি রকম ছিল ?

৫। তৈমুর লঙ্গের ভারত অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) সুলতান মামুদ ছিলেন ঘুর বংশীয় সুলতান। (খ) দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন গিয়াসুদ্দিন বলবন। (গ) তুঘলক বংশের পতনের পরে খলজি বংশের রাজত্ব শুরু হয়। (ঘ) কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন।

২। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) মহম্মদ-বিন-কাসিম কে ছিলেন ? (খ) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (গ) মধ্যযুগের কোন্ সুলতান খামখেয়ালি ছিলেন ? (ঘ) সুলতানী আমলে কোন্ নারী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (ঙ) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন্ সুলতান মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ? (চ) কবীরের দোঁহা কি ? (ছ) শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (জ) শ্রীচৈতন্য কোন্ ধর্ম প্রচার করেন ? (ঝ) হিন্দীতে কে রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন ?

৩। সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান দেখাও ঃ—দিল্লী, দৌলতাবাদ, পাঞ্জাব ও বাংলা।

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে রোম আর কনস্টাণ্টিনোপল—এই দুটি নগরীর ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মধ্য যুগের সূচনায় বর্বর জাতিগুলির একটানা আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। তারা রোমনগরীকে বিধ্বস্ত করে। তখন সমৃদ্ধশালী রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছিল। এই অবস্থায় চতুর্থ শতকে দূরদর্শী রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে এক নতুন নগরী স্থাপন করেন। এই নগরীর নাম হয় কনস্টাণ্টিনোপল। এই নগরীটি সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের এক অতুলনীয় কীর্তি। এই নগরীতে বসেই একসময় দূরদর্শী সম্রাট জাস্টিনিয়ান শাসন করেছিলেন। আর একে আশ্রয় করে টিকেছিল অতুলনীয় বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। প্রায় হাজার বছরব্যাপী এর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। পঞ্চদশ শতকে দুর্ধর্ষ অটোমান তুর্কী জাতির ক্রমাগত অভিযানে এই নগরীর পতন হয়। একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে এই নগরীটি বহন করেছিল নতুন আলো। আর এর পতনে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ কনস্টাণ্টিনোপলের পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেদিন ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। আর তাতে ধ্বংসের মধ্যেও দেখা দেয় নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এক যুগের অবসানে শুরু হয় নতুন যুগের। ঐতিহাসিকেরা এই নতুন যুগের নামকরণ করেছেন **রেনেসাঁস** বা **পুনরুজ্জীবন**। আমরা এই প্রসঙ্গ আলোচনায় পরে আসছি।

অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্টাণ্টিনোপলের পতন : ক্রুসেডের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে সেলজুক তুর্কী নায়ক সালাদিনের বীরত্বের কাহিনী আমরা আগে পাঠ করেছি। এদেরই আর একটি শাখা হল অটোমান তুর্কী। তুর্কীদের এ দলটির **ওসমান** নামে একজন দলনায়ক ছিলেন। ওসমান নামটিকে বিকৃত করে ইউরোপীয়রা বলত **অটোমান**। পরে এরা **অটোমান তুর্কী** নামে পরিচিত হয়। এই অটোমান তুর্কীদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত তুর্কীস্তানে। মঙ্গোলবীর চিঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে আসে। সে সময়ে সেলজুক তুর্কীরা এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত **অ্যানাটোলিয়াতে** রাজত্ব করছিল। অটোমানেরা সেখানে এসে হাজির হয়। তখন সেলজুক তুর্কীরা একটি যুদ্ধে মেতেছিল। তারা তাদের পক্ষ নিয়ে এই যুদ্ধে অংশ নেয়। তার ফলে সেলজুকরা জয়ী হয়ে অটোমানদের নানাভাবে সাহায্য করে। ক্রমে ক্রমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ওসমানের রাজত্বকালে এই তুর্কী দলটি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। সেলজুকদেরও প্রতিপত্তি কমে আসে।

অটোমানেরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিল। তারা সেলজুকদের অধীনে এশিয়ার বহু অঞ্চল জয় করে নিজেদের অধীনে আনে। তারপর তাদের দৃষ্টি পড়ে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বহু ছোট ছোট অঞ্চলে। অটোমান তুর্কীরা এই সব রাজ্য জয় করে তাদের শক্তি বাড়িয়ে তোলে। ইতিমধ্যে **চাঘতাই** তুর্কী নায়ক **তৈমুর লঙ্গের সঙ্গে** যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অটোমান সুলতানেরা সাময়িক কালের জন্য তাঁদের আক্রমণের নীতি বর্জন করেন। তৈমুর লঙ্গকে তাঁরা কর দিতে থাকেন।

তৈমুর লঙ্গের ভারত অভিযানের প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে অটোমান তুর্কীরা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল অধিকারের চেষ্টা করে। তখন দুর্বল রাজাদের শাসনে এই নগরীর প্রতিপত্তি ও গৌরব একেবারে নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। অবশেষে **সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ** এই প্রাচীন নগরী অধিকার করেন (১৪৫৩ খ্রীঃ)। খ্রীস্টান আর ইসলামধর্মের বিরোধের পরিণতিতে দীর্ঘকালব্যাপী চলেছিল **ক্রুসেড** বা ধর্মযুদ্ধ। আর এতে ইউরোপের বহু সমৃদ্ধশালী শহর বিধ্বস্ত হয়। প্রাচীন কীর্তির অবলুপ্তি ঘটে। অটোমান তুর্কীরা ধর্মে ছিল মুসলমান। চরম ধর্মবিদ্বেষের ফলে কনস্টাণ্টিনোপল অধিকার করেই তারা থামল না, শুরু করে দিল ধ্বংসের তাণ্ডব। শহরের বহু অট্টালিকা ধ্বংস করল। বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাকে বিধ্বস্ত করল। এতে এই শহরের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমতে শুরু করল। কনস্টাণ্টিনোপলের সম্রাট মাত্র নয় হাজার সৈন্য নিয়ে পরাক্রান্ত অটোমান তুর্কীদের প্রতিরোধ করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ তাঁর সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে চারদিক ঘিরে রাখলেন। তুর্কীদের কামানের গোলায় শহরের জীর্ণ প্রাচীর ভেঙে ফেলল। প্রায় দুমাস অবরোধের পরে তুর্কীরা শহরে প্রবেশ করল। যুদ্ধে জয়ী হবার পরে তারা সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাকে ভেঙে মসজিদে পরিণত করল। খ্রীস্টধর্মের পরিবর্তে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য সূচিত হল। প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী এই প্রাচীন শহর তুর্কী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল।

রেনেসাঁসের সূচনা : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক আবিষ্কার : আমরা আগেই জেনেছি, বাইজানটাইন আগে ছিল গ্রীকদের একটি উপনিবেশ। রোমান প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার পরেও এখানে গ্রীক প্রভাব বজায় ছিল। এখানে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁরা কনস্টাণ্টিনোপল নগরীর পতনের পরে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। নতুন করে গ্রীক-রোমান ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির চর্চা শুরু করে দেন। ইউরোপের ইতিহাসে শুরু হয় **রেনেসাঁসের**। এই রেনেসাঁস কথাটির অর্থ হল **পুনরুজ্জীবন**। গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা : প্রাচীন ইতিহাসে আমরা এথেন্সের স্বর্ণ যুগের কথা পড়েছি। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদির চর্চাতে গ্রীকগণ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তীকালে রোমানেরা গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী হয়। কনস্টাণ্টিনোপলের পতনের পরে এখানকার গ্রীক পণ্ডিতেরা ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পালিয়ে গিয়ে নতুনভাবে গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। আগে কনস্টাণ্টিনোপল ও তার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে পণ্ডিতেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা করতেন। এবার সমস্ত ইউরোপ তাঁদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়। তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অসাধারণ সমৃদ্ধি ঘটে। অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার জন্য দিকে দিকে শুরু হয় নতুন করে অনুসন্ধানের পালা।

স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় দেশের প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাধান্য ছিল। কি রাষ্ট্রে, কি ধর্মে, কি সমাজে স্বাধীন যুক্তি-তর্কের কোন স্থান ছিল না। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে সমাজে রূপান্তর দেখা দেয়। এ সময়ে স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভাবধারা ইউরোপবাসীদের জীবনকে প্রভাবিত করে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে যেমন, ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, প্যারিস, লণ্ডন, হামবুর্গ, নুরেমবার্গ ইত্যাদি বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। বাণিজ্যিক খ্যাতির জন্য এ সব অঞ্চলে দেশ-বিদেশের লোক আসত। তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান চলত।

এ সময়ে ইউরোপের নানা স্থানে বহু চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। ইতিপূর্বে প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন। রোজার বেকন, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হন। সাহিত্য জগতে বোক্কাচিও, চসার, দান্তে, সেক্সপীয়র প্রমুখের সাহিত্য সৃষ্টিতে নতুনত্ব দেখা দিল। র‍্যাফেল, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি প্রমুখের শিল্প সৃষ্টিতে মৌলিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে। জন ওয়াইক্লিফ, এরাসমাস, কলেট প্রমুখ ধর্মাচার্য ধর্মের দিক থেকে নতুন মত ও পথের সন্ধান দেন।

রেনেসাঁস প্রথম শুরু হয় ইটালীতে। এরপর পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জার্মানীতে রেনেসাঁসের প্রভাবে শিল্পের বিকাশ এবং বিদ্যাচর্চার উন্নতি ঘটে। জার্মানীতে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। তাতে নানা রকম বই ছেপে প্রচার করার

সুবিধা হয়। কম্পাস আবিষ্কারের ফলে নাবিকদের সমুদ্রপথে দিক্‌নিরূপণ সহজসাধ্য হয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার : অজানাকে জানার আগ্রহ কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের মানুষ তা উপলব্ধি করে। নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন হয়েছে। এবার চাই পণ্য উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল। তাই স্বদেশের বাইরে থেকে তা সংগ্রহ করার দিকে দৃষ্টি পড়ল। আগের অধ্যায়ে আমরা মার্কো পোলোর কথা পড়েছি। বহু দিন চীনে বাস করার পর মার্কো পোলো তাঁর স্বদেশভূমি ইতালীতে ফিরে গিয়ে সকলকে চীনের ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদের কথা বলেন। অনেক আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু জলপথে কেমন করে ভারতে পোঁছানো যায় তা কারও জানা ছিল না। ক্রুসেডের সময়ে আবার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এশিয়ার ঐশ্বর্যের কথা ইউরোপবাসী শুনেছিল। রেনেসাঁসের প্রভাবে এবার তারা অজানা দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠল। কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল নাবিকেরা। ইতিমধ্যে সমুদ্রের দিক্‌নিরূপণ করার জন্য কম্পাস যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হয়। মানুষের মনে দেখা দেয় নতুন অনুপ্রেরণা, নতুন অনুসন্ধিৎসাবোধ। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম—সকল ক্ষেত্রেই যুক্তির নির্দেশ প্রাধান্য লাভ করে। মানসিক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তাদের সামনে এক নতুন জীবনাদর্শ স্থাপিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য চর্চার ব্যাপক উন্নতি শুরু হয়।

জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব : রেনেসাঁসের প্রভাবে রাজনৈতিক জীবনধারারও রূপান্তর দেখা দেয়। শার্লামেনের সময় থেকে প্রত্যেক রাজা **পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের** অধীনে রাজারূপে শাসন চালাতেন। রেনেসাঁসের ফলে যে যুক্তিবাদের বিকাশ হয় তারই প্রভাবে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় রাজার ধারণা জন্মায়। একই অঞ্চলের বসবাসকারী এবং একই ভাষাভাষীরা তাদের নিজের দেশের রাজার অধীনে থাকতে চায়। প্রত্যেক জনসমষ্টি নিজেদের স্বাধীন দেশে স্বাধীন রাজা মনোনয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়। ফলে আধুনিক জগতে রাষ্ট্র-নৈতিক আদর্শ ও জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়। এরই প্রভাবে এই সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদি দেশ স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের আকার নেয়। পর্তুগালও অন্য দেশের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

ইংলণ্ডে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাত : মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় ইংলণ্ডের স্বৈরাচারী রাজা **ম্যাগনাকার্টা** বা

রাজসনদে স্বাক্ষর করে অভিজাত সামন্তদের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হন। ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে সাইমন-ডি-মণ্টফোর্ড পার্লামেণ্ট বা সংসদের একটি সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় ব্যারণ, পাদ্রীদের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাপন্ন চাষী এবং নগরবাসী অভিজাতেরাও অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের প্রসার ঘটে। রাজাদের স্বৈরাচারী এবং অভিজাত ও জনসাধারণের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টার ফলে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাত তীব্রতা লাভ করেছিল। এরই প্রভাবে পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে **পার্লয়ামেণ্ট** বা সংসদ জন-সাধারণ ও নাগরিকদের স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত হয়। ব্যারণ ও পাদ্রীদের স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্টি হয় **'হাউস অব লর্ডস'**। অবস্থাপন্ন চাষী এবং নগরের লোকদের স্বার্থে গঠিত হয় **'হাউস অব কমন্স'**। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই দুটি সভার গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করে।

শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডে এভাবে নতুন-পুরাতন ভাবধারার সংঘাত তীব্রতা লাভ করেছিল। ইংলণ্ডের ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী শক্তিরূপে প্রোটেস্টাণ্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির মধ্যে শার্লামেনের সময়ে যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে সেই সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। মধ্যযুগের শেষ দিকে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাতের ফলে ইংলণ্ডের রাজা **অষ্টম হেনরী** নিজেকে পোপের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব মুক্ত ও স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির মধ্যে এ সময় থেকে বিবাদ ও বিসম্বাদ দেখা দেয়।

ইউরোপের প্রসার ঃ পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপের নানা দেশ বাণিজ্য ও ধর্মবিস্তারের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যিক অভিযান চালায়। ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক **বার্থলোমিও দিয়াজ** উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। এর দশ বছর পরে **ভাস্কো-ডা-গামা** ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন। ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে ইটালীর নাবিক **কলম্বাস** স্পেনের সহায়তায় আমেরিকার সংলগ্ন একটি দ্বীপে যান। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকেই পর্তুগীজ নাবিকগণ সিংহল, সুমাত্রা, চীন ও জাপানে উপস্থিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপীয় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য এভাবেই স্থাপিত হয়েছিল। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। ভৌগোলিক অভিযানের মধ্য দিয়ে তা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁস এবং ধর্ম-সংস্কারের ফলে ইউরোপীয়রা ইউরোপের সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমানায় নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ যুগেই পৃথিবীতে ইউরোপীয়-করণ শুরু হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়। আধুনিক যুগের

ইতিহাসে **ইউরোপের প্রভাব বিস্তার** একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। রেনেসাঁস বা পুনরুজ্জীবন ইউরোপীয়দের মনে অজানাকে জানা এবং নতুনকে আবিষ্কার করার প্রেরণা দিয়েছিল। আর ধর্ম-সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপীয় শক্তির প্রসার ঘটে। এর প্রভাবে ইউরোপের শক্তিশালী জাতিগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে। বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তারা খ্রীস্টানধর্মের প্রসারেও উদ্যোগী হয়। এর ফলে দেশ-বিদেশে খ্রীস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্টান্টিনোপল নগরীর পতনের কাহিনী লেখ। ২। রেনেসাঁস কথাটির অর্থ কি? কখন ও কিভাবে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল? ৩। রেনেসাঁসের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কিরূপ সমৃদ্ধি দেখা দেয়? ৪। রেনেসাঁসের প্রভাবে কেমন করে ভৌগোলিক আবিষ্কার শুরু হয়? ৫। ইংলণ্ডে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংঘাত সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। রেনেসাঁসের যুগে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাদের অবদানে নতুনত্ব দেখা দেয়? ২। জাতীয়তাবোধ কখন ও কিভাবে দেখা দিয়েছিল? ৩। জাতীয় রাষ্ট্র বলতে কি বোঝ? ৪। ইউরোপের প্রসার সম্পর্কে কি জান?

বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

১। নীচের উক্তিগুলি সমর্থনযোগ্য হলে পাশে "হ্যাঁ" এবং সমর্থনযোগ্য না হলে পাশে "না" লেখ ঃ

(ক) রেনেসাঁস কথাটির অর্থ হল পুনরুজ্জীবন। (ক) ... ...

(খ) অটোমান তুর্কীদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়। (খ) ... ...

(গ) মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ছিলেন রেনেসাঁস যুগের একজন কবি। (গ) ... ...

(ঘ) রেনেসাঁসের প্রথম সূচনা হয়েছিল ইতালীতে। (ঘ) ... ...

২। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) অটোমান কথাটি কেমন করে এসেছে? (খ) কোন্ অটোমান তুর্কী সুলতান কনস্টান্টিনোপল নগরী ধ্বংস করেন? (গ) রেনেসাঁসের যুগের একজন সাহিত্যস্রষ্টার নাম কর। (ঘ) রেনেসাঁসের যুগের দুইজন বৈজ্ঞানিকের নাম বল। (ঙ) ম্যাগনাকার্টা কি?